"যে কোনো বস্তুই হউক তাহা যদি লোকের নিকট স্ফুরিত হয় (অর্থাৎ সহৃদয় ব্যক্তির চমৎকৃতি উৎপন্ন করে) তবে সেইখানেই এই চমৎকৃতি (অর্থাৎ রস) সুসিদ্ধ হয়।"

ধ্বন্যালোক।

এই গ্রন্থের প্রথম ছয়টি কবিতা ১৯৩১ সালের পূর্বে লেখা; অবশিষ্ট কবিতাগুলি পরবর্তী সময়ের। অনেকগুলি অনুবাদ কবিতা আছে। ঋগ্‌বেদের কতকগুলি বিশিষ্ট সূক্তের কাব্যানুবাদ ইতিপূর্বে আমার 'বৈদিকী' গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে অনূদিত কবিতাগুলি তাহারই জের টানা। কবিতাগুলির মধ্যে প্রথম কবিতা বাদে অন্যান্যগুলির মূল বৈদিক সূক্ত।

শ্রীঅরীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়

শ্রীঅরীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়ের
অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ :
আকাশ গঙ্গা ।
নতুন কবিতা ।
চার্বাকের উক্তি ।
বৈদিকী ।

প্রকাশকের নিবেদন

কবি ৺অরীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়—তাঁর সর্বশেষ এই কাব্যগ্রন্থ মুদ্রিত দেখে যেতে পারলেন না, এটাই সকলের মনে পরম দুঃখ জাগিয়ে রেখেছে। তিনি 'ঋষি গৃৎসমদের প্রার্থনা' নাম দিয়ে—তাঁর কবিতাগুলির পাণ্ডুলিপি "বাণীতীর্থে" মুদ্রণের জন্যে পাঠিয়েছিলেন ও প্রায় ২।৩ ফর্মার প্রুফ্ ইত্যাদি নিজের হাতেই সংশোধিত করে গেছলেন; কিন্তু মহাকালের আহ্বানে তাঁকে মাত্র অর্ধসপ্তাহের রোগভোগে ধরাধাম পরিত্যাগ করতে হ'ল,—১৩৭২ সনের চৈত্র-সংক্রান্তির প্রভাতে। তাঁর অনুতপ্ত আত্মীয় বান্ধবের নিকটে তাঁর এই গ্রন্থ শেষ স্বাক্ষর নামে স্মরণীয় হয়ে থাকবে—এ আশায় কিছু কালবিলম্ব ঘটলেও, এই প্রকাশনার কাজ সমাপ্ত ক'রে কবিতর্পণ করার সুযোগে নিজেকে ধন্য মনে করছি। কবি জীবিতকালে অথর্ববেদের এক সুদীর্ঘ রচনা—"পৃথিবী-সূক্তের" নকল সংগ্রহ করেছিলেন, তাঁরই পরিচিতা কবি কল্যাণী দত্তের কাছ থেকে। কবির স্বয়ংকৃত অনুবাদকার্য তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে অসমাপ্ত থেকে যায়, তাই সুধীজনের অনুরোধে "পৃথিবী-সূক্তের" সুষ্ঠু অনুবাদ করেছেন অধ্যাপিকা ও কবি শ্রীযুক্তা কল্যাণী দত্ত। এ গ্রন্থে তাঁর কবিতাটি সংযোজিত করতে পেরে আমি কৃতজ্ঞ এবং মনে করি পরজগৎবাসী কবিপ্রাণও পরিতৃপ্ত! আরও একটি বাসনা যা কবি প্রকাশ করে গেছেন, তাও অপূর্ণ রাখা হয়নি। তিনি ইচ্ছে করেছিলেন যে তাঁর নব-প্রকাশিত পুস্তকখানি তিনি সুপণ্ডিত ডঃ সুকুমার সেন মহাশয়ের নামে উৎসর্গ করবেন; তাঁর সেই মানস-চিন্তা বর্ত্তমান গ্রন্থখানির উৎসর্গপত্রে রূপায়িত করে সার্থকতা বোধ করছি।

সর্বশেষে এ গ্রন্থ প্রকাশে যাঁরাই সহযোগিতা করেছেন সকলের কাছে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বিঁশেষ করে কবির জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র শ্রীপ্রবেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটানা পরিশ্রম ও মুদ্রাকরের সঙ্গে সংযোগরক্ষা ব্যতীত—কবির এ শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করা যে সুকঠিন হ'ত, সে কথা অস্বীকার করার উপায় নেই; সেও কবির আশীর্বাদের অংশভাগী! মুদ্রাকরের ভ্রম-প্রমাদের জন্য মার্জনা প্রার্থনীয়।

ইতি

অধ্যাপক বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচীপত্র

ঋগ্‌বেদের কাব্যানুবাদ

পুকুরের ধারে জাম গাছ
জলের উপরে আছে ঝুঁকে,
এলোমেলো হাওয়াদের-নাচ
দোলাদেয় শাখাদের বুকে।
টপ করে পড়ে কাল জাম,
টুপ করে ছোট শব্দ হয়,
বোঁটাখসা তার পরিণাম,
সে এমন বেশী কিছু নয়।
ঠিকরায় এক বিন্দু জল
বৃত্তাকারে ঢেউ গোটাকত ;
তা'র পর সমস্ত নীরব,
কিছুই হয়নি এই মত।

ঋষি গৃৎসমদের প্রার্থনা

কাল

আজ চলেছে রাহুর দশা, বৃহস্পতি লাগবে কাল ;
আজকে মেঘা, কাল্‌কে সাঁজে উঠ্‌বে গো চাঁদ সোনার থাল ।
আজ্‌কে তোমার নাইক দেখা, দিনটা বুঝি বৃথাই হয় ;
কাল সকালে ডাক্‌বে পাখী, আসবে তুমি সুনিশ্চয় ।
জল্‌সাটা আজ জম্‌ল না'ক, গানের গেল তাল কেটে ;
কাল সকালে আসবে গুণী, করবে সভা একচেটে ।
আজকে পথে একলা চলি সঙ্গিহারা, নেইক কেউ ;
কাল বিদেশী পথের সাথী আসবে তুলে কথার ঢেউ ।
আজকে যদি খেলায় হারি—এমন বেশী কিছুই নয় ;
কাল্‌কে দেখ পড়্‌তা নতুন, কাল্‌কে হবে হবেই জয় ।
আজ যা কুঁড়ি রয়েই গেল কাল তা' ফুটে উঠ্‌বে ফুল ;
আজ যে মানিক পাওনি খুঁজে কাল তা' পাবে ; নাইক ভুল !
যাদুকরের ভেল্কী-ভরা কুহক-ঢালা দিন সে কাল ;
তা'রির লাগি কাটিয়ে দেব আজকে দুপুর সাঁজ সকাল ।

চেনা

জীবনের পথ ধরি এতকাল আসিলাম চলি ;
কত কিছু দেখিলাম—হাসি কান্না কত বলাবলি।
কত তথ্য খুঁটিনাটি প্রতিদিন পুঞ্জীভূত হয়,
কত তত্ত্ব-পরিচ্ছেদ, অনুমান, বিতর্ক, সংশয়।
কত লোকে কত বলে ভালমন্দ ; তুলাদণ্ড ধরি
আমিও বিচার করি তাহাদের জীবন্তে কি মরি
গোচরে এসেছে যারা। তবু হায়, নাহি বোঝাবুঝি ;
বঙ্কিম সর্পিল দেখি প্রথমে যা ভাবি সোজাসুজি।
হয়ত তারেই জানি ক্ষণিকের আড়ালে যা জানা ;
যাহারে ঠেলেছি দূরে তা'রি আনাগোনা দেয় হানা
মনের দুয়ারে নিত্য। যে তারাটি প্রভাতে সন্ধ্যায়
স্নিগ্ধ চোখে চেয়ে থাকে প্রতিদিন মোর প্রতীক্ষায়
অনেক তারার ভীড়ে অজানিত্—আনমনে যারে
ভাল করে দেখি নাই—মনে হয় আজ চিনি তারে।

ভোরের বাউল

অচেনা কোন বাউল এসে
গাইছে ভোরে গান,
ঘুমন্ত তুই পাশ ফিরে শোন
একটু দিয়ে কান।

ভাঙবেত ঘুম খানিক পরে
শুন্‌বি তখন আঁধার ঘরে
লুটিয়ে কাঁদে সুরের ভাষা
ফুরিয়ে গেলেও গান।

এমনি বাউল রোজই আসে
রোজ সকালে গান করে
বিশ্ব যখন আলো-আঁধার
নেশার মত ঘুম ধরে ;
একতারা তাঁর এমনি সুরে
নিকটে কি কোন্‌ সুদূরে
যুগান্তরের কাহিনী গায়
অনাদরের মান ভরে।

রোজ সকালে ভাবিস মনে
কাল্‌কে শুয়ে থাক্‌বি না।
ভোরের বেলা রইবি জেগে
ডাকতে তারে ছাড়্‌বি না।
আপন ঘরে সভা করে
আন্‌বি তারে হাতে ধরে—
একটি গায়ক একটি শ্রোতা—
শুনতে সে গান ভুলবি না।

ঘুমের ঘোরে আবার ভুলিস,
এমনি ভোলা প্রাণ,
শুধুই শুনিস ভোরের বেলা
গাইছে বাউল গান।

স্মৃতির সৌরভ

অবসান আছে বলে ব্যর্থ কি গো স্বরগ-কল্পনা ;
ঝরে যদি মন্দারের ফুল তবু সত্য নন্দন রচনা।
জীবনের শেষ-সন্ধ্যা-বেলা মরালের কণ্ঠে গীত ফুটে,
সত্য সেই শেষের সঙ্গীত—বিশ্ব-রন্ধ্রে উছলিয়া উঠে।
ভেঙে যায় স্বপন-বাসর, গান তার লেগে থাকে কানে ;
সন্ধ্যা ডুবে নিশার আঁধারে, স্বপ্ন-ছবি আঁকা থাকে প্রাণে।
দু'জনায় দু'দণ্ডের দেখা, নিমিষের চোখে চোখে চাওয়া,
তারি মাঝে মিশে দুটি-প্রাণ—আপনায় আপনায় পাওয়া।
বৃন্দাবন কবে নিভে গেছে, ব্রজলীলা কবে অবসান ;
তবু জাগে এখনও হিয়ায় সেই আলো সেই বাঁশীগান।

অভিশাপ

শান্ত তপোবন ঘিরে মালিনী বহিছে ধীরে,
তীরে মুনি কণ্বের আশ্রম
লতায় পাতায় ঢাকা শান্তির অমিয়মাখা
ছায়াস্নিগ্ধ সদা মনোরম।
মাতৃক্রোড়ে মাথা থুয়ে সিংহশিশু আছে শুয়ে,
মৃগ করে অঙ্গ-কণ্ডূয়ন ;
বসন্ত বরষাধারা শরতের হেমঝারা
একসাথে দেয় দরশন।
সুপ্তিগত আঁখিভার চাপিয়া কুটীর-দ্বার
মৃগশিশু করে রোমন্থন ;
দিবস-আতপ-তপ্ত নীবারের কণা যত
শুকাইছে ভরিয়া অঙ্গন।

যজ্ঞধূমে কৃষ্ণবর্ণ বৃক্ষের নবীনপর্ণ
শাখাপ্রান্তে শুখায় বল্কল,
ফুলভরা তরুলতা, শুকসারী কহে কথা,
আলবালে জল টলমল।

শব্দহীন গৃহকোণে বসি একা অন্যমনে
ভাবিতেছে শকুন্তলা কথা কবেকার,
সে কোন দিবস-শেষে মৃগয়ার ছদ্মবেশে
এসেছিল নরপতি সমগ্র-ধরার।
সমস্ত জীবন বাহি যার লাগি পথ চাহি
আছে কত রাজকন্যা প্রণয়-স্বপনে
সে কেন এ তপোবনে তাপসী-কন্যার সনে
আপনারে ধরা দিল বিবাহ-বন্ধনে।
কোন দূর জন্মান্তের এই প্রণয়ের ফের
আবার আনিল গাঁথি মিলন মধুর,
এ কোন চাঁদের লেখা অকাল-নিশীথে দেখা
জাগাল হিয়ার মাঝে স্বরগ সুদূর।

দিবসের ছায়া সনে বেড়ে আসে কথা মনে
কত ভাব কত স্মৃতি উঠিছে উছলি।
মানস-সায়র-বুকে ফেলি আলো শতমুখে
কল্পনার শিশু-রবি উঠিছে উজলি।
নদী-জলে জ্বলে তাপ গরজিছে অভিশাপ
জীবনের মহানাট্য করিয়া সৃজন;
দূর শূন্যে আঁখি তুলি সে শুধু আপনা ভুলি
প্রণয়ের স্বর্ণমৃগ করে অন্বেষণ।

———

ভাসে চাঁদ মেঘের ভেলায়

[স্থান দিল্লী]

ভাসে চাঁদ মেঘের ভেলায়
আকাশের নীল বুকে।
নিম্নে গিরিশ্রেণী
কুরুপাঞ্চালের দেশ
সহস্র-রাজার-স্মৃতি-মর্ম্মর-মধুর।
দূরে পলাশের ডালে ময়ূর ময়ূরী ;
আরও দূরে অভ্র-দীপ্ত বালুচর-বুকে
নিদ্রামগ্ন মৃগযূথ,
পার্শ্বে তার শব্দহীন গুজরের গ্রাম
মাটির বেড়ায় ঘেরা।

এ অনন্ত সুপ্তির সংসারে
নিদ্রাহীন তুমি আমি !
এই নীল আঁখি দুটি তুলি
কি দেখিছ চকিত চকিত !
চরণ-নূপুর-ধ্বনি রহিয়া রহিয়া,
উৎক্ষিপ্ত-অঞ্চল-প্রান্ত নীল উত্তরীয়
কি কথা বলিতে চায় !
ভয়-আবরণে
অর্দ্ধ-গূঢ় কি তা'দের ভাষা
অবসন্ন শীতান্তের মত
মাগিছে বসন্ত-মুক্তি !

আজিকার নির্জন রজনী
অনন্ত কালের সূত্রে
রাত্রি ও দিনের কৃষ্ণ-শুভ্র-পুষ্পে গাঁথা
বিচিত্র মালার আরও একখানি ফুল।
প্রাণের কামনা-রস
বাসনার বিকসিত রঙ
যদি নাহি করে এরে অম্লান উজ্জ্বল
কার্পণ্য-কুণ্ঠার দাগ রবে চিরদিন
আমাদের দু'জনার নামে।
নটেশের ঋত-নৃত্যে নিত্য বিলসিত
অনন্তের যাত্রাপথে
সৃজন তাহার
প্রতি নারী আর প্রতি নরের হিয়ায়
অনুরাগ-রসোল্লাসে।
আজিকার অজানা উৎসবে
যে সুর বাজাবে তুমি,
নয়নের কোণে যে বিদ্যুৎ উৎসরিবে,
স্মিত বিম্বাধরে যে ভাষা উঠিবে জাগি
মহাকাল-বক্ষের মালায় অমর রহিবে চিরদিন।

সে কথা স্মরিয়া
চেয়ে দেখ সখি
ওই ময়ূর চঞ্চল হল,
মৃগযূথ উঠে জাগি,
গুঞ্জয়ের গ্রামে কে গাহিছে অকারণ গান!

গণিকা

[প্রাচীন যুগে লিচ্ছবি রাজ্যে একটা বিধান ছিল যাহার বলে রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠা সুন্দরীকে অভিজাতবর্গের ভোগ্যা গণিকার স্থান গ্রহণ করিতে হইত।]

রাজপথ সন্ধ্যাকাল ধুমধাম ভারি ;
মোটার, ঘোড়ার গাড়ী, লোক সারি সারি
দলে দলে চলিয়াছে আপনার কাজে
কহিয়া বিচিত্র কথা বিচিত্রিত সাজে।
সহসা উপর পানে তুলিয়া নয়ন
প্রদীপের শিখা এক করিনু দর্শন।
আলোর পশ্চাতে দু'টি ব্যথাভরা চোখ
এক দৃষ্টে চেয়ে আছে যেথা জনস্রোত
আপনার গতিপথে অনন্ত ধারায়
নাম-নাহি-জানা কোন সিন্ধু পানে ধায়।
সঙ্গেতে ছিলেন বন্ধু ধর্ম-ব্যবসায়ী
চিত্ত তাঁর ঈশ্বরের পাদপদ্মশায়ী।
কহিলেন, পতিতা ও নারী একজন
পাপ-ব্যবসার তরে করি আকিঞ্চন
রহিয়াছে দ্বারে বসি। সহরের বুকে
এরা বাসা বেঁধে রবে, মোরা স্তব্ধ মুখে
সহিব এ কলুষতা! দেখ' শীঘ্র তুমি
এদের ছাড়াব আমি এ শহরভূমি।

অনেক বছর আগে একদিন, ইতিহাসে না কি বলে,
'বিচারপ্রার্থী শ্রেষ্ঠী আসিল লিচ্ছবি-সভাতলে।

কহিল শ্রেষ্ঠী, হে নরপালক, নিখিল-শরণভূমি!
অতিদীন আমি করি অভিযোগ তোমার চরণ চুমি।
পড়ি অভিযোগ-পত্র রাজার ঘুরিয়া উঠিল মাথা,
চামরধারীরা ঢুলায় চামর, ছত্রী ধরিল ছাতা।
কহিলেন রাজা মন্ত্রীরে চাহি, শুন হে বিজ্ঞবর,
শ্রেষ্ঠীকন্যা মধুমালবিকা কি ঘটাবে এর পর!
গত বৎসরে মধু-উৎসবে এই কন্যার লাগি
ধনদত্ত ও দেবদত্তেতে হয়েছিল রাগারাগি,
তা'র পরে ধনদত্ত হানিল দেবদত্তকে ছুরি,
দেবদত্তের বিধবা পত্নী অভিযোগ দিল যুড়ি।
বিচারে হইল ধনদত্তের পত্নীর সম দশা,
ফলে উভয়ের শূন্য ভবনে আজ গান করে মশা।
এ বছর দেখি সাত জন পুনঃ প্রণয়প্রার্থী হয়,
দণ্ডধর যে রাজার উপাধি একথা মিথ্যা নয়।

শুনিয়া মন্ত্রী গম্ভীর মুখে খুলিয়া পুঁথির পাতা,
কপাল অনেক কুঞ্চিত করি, অনেক নাড়িয়া মাথা
কহিলেন শেষে, রাজা মহাশয়! ভাবনা কি আর আছে,
শাস্ত্রে লিখেছে এমন ব্যাপার মাঝে মাঝে ঘটিয়াছে;
গণের সকলে চাহিছে ইহাকে সকল-ভোগ্যা করি,
সকল গণের হউক এ নারী সকল বিপদ হরি।

তা'র পর কত যুগ চলে গেছে কালের দোলায় দুলি,
সে দিনের কথা গত বহুদিন, সকলে গিয়াছে ভুলি।
আজ সন্ধ্যায় নগরীর পথে জনতার কোলাহলে
চির-বিচিত্র মানবজীবন বিচিত্র পথে চলে।

সবার মাঝারে উজ্জ্বল হয়ে ওই ম্লান আঁখি তুটি
আলোর পিছনে তৃষিত করুণ নীরবে রয়েছে ফুটি।
আপন তীব্র কামনার রসে ফুটায়ে বিষের ফুল
বিমূঢ় মানব আজি ক্ষত-দেহ আপনি করিছে ভুল।
আপন দম্ভ যাহারে সৃজিল আজিকে দম্ভ ভরি
ধার্মিক বলে নাশিব তাহারে সমূলে আঘাত করি।
ওগো অতৃপ্ত তৃষিত হৃদয়! নীরবে কি দেখ চাহি,
লিচ্ছবি-দেশে যে জনতা ছিল আমি তা'র অনুবাহী!
তাহাদের সেই গুরু অপরাধ, হীন দম্ভের গ্লানি
আমারও এ প্রাণে রয়েছে লুকায়ে মনে মনে তাহা জানি।
তুমি যে পতিতা আমারই কারণ, আমারই কালিতে কাল,
আমারই তৃষার কাল অতৃপ্ত বহ্নির শিখা জ্বাল।
নিশি নিশি নাও অঞ্জলি ভরি সমাজের পাপরাশি,
প্রভাতে আবার প্রসন্ন ধরা দিকে দিকে উঠে হাসি।
কত গৃহ তুমি পবিত্র রাখ, কত না নারীর মান,
হয়ত কত না ক্লান্ত হৃদয়ে দিয়াছ তৃপ্তিদান।
তুমি সমাজের গরল শুষিয়া অমৃতে অমর রাখ,
সুন্দরে তুমি সুন্দর কর, আপনি ম্লানিমা মাখ।
ওগো অতৃপ্ত তৃষিত হৃদয়! নীরবে কি দেখ চাহি,
তোমারই অনয়ে আমরা চলেছি নীতির বর্ত্ম বাহি!

———

মোনা লিসা

[লিওনার্দো দা ভিঞ্চির প্রসিদ্ধ ছবি মোনা লিসার মুখে যে বিস্ময়কর হাসিটি ফুটিয়া রহিয়াছে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে তাহা আধখানা ঠোঁটের হাসি। ইদানীং গ্রন্থাদিতে সন্ধান পাওয়া গিয়াছে যে নিজেদের পুরুষজাতির দৃষ্টিতে আকর্ষণীয় করিবার জন্য সে যুগে নারীরা যত্ন-সহকারে ঐ প্রকার হাসির অভ্যাস করিতেন।

ছোটনাগপুরের সুরগুজা জেলায় রামগড় পাহাড়ের মধ্যে যোগীমারা গুহায় খোদিত তিন ছত্র এক প্রত্নলিপি আছে। সুতনুকা নামে দেবদাসী ; তাহাকে কামনা করিয়াছিল বারাণসীবাসী দেবদিন নামে রূপদক্ষ—অনুবাদে এইরূপ দাঁড়ায়। লিপিটি সুতনুকা-প্রত্নলিপি নামে খ্যাত।]

মোনা লিসা তব আধেক ঠোঁটের হাসি
অনেক দিনের সাধনায় হয়ে সাধা—
আজিকে যদিও অনেক দিনের বাসি—
পুরুষজাতির চক্ষে লাগায় ধাঁধা।

পতঙ্গ তার মরিতে আগুন চাই।
তাই সে খুঁজিছে কোথাও বহ্নি-শিখা ;
আগুনে পুড়িয়া আপনারে করা ছাই
ভবিতব্যতা তাহার ভাগ্যলিখা।

সুতনুকা নামে ছিল এক দেবদাসী
তাহারে কামনা করেছিল দেবদিন
রূপদক্ষ সে বারাণসীধাম-বাসী,
এইটুকু কথা, বাকীটা অর্থহীন।

পাণ্ডুরং তাত্যা সিন্দে

["Smoking a bidi was stated to be the last desire of Pandurang Tatya Shinde of Miraj Taluka who was sentenced to death on a charge of murder. Before being taken to the gallows the accused was asked to state what-his last desire was. In reply he stated that he wished to smoke a bidi."]

(U. P. I.) Amrita Bazar Patrika 7. 7. '56

জীবনের অর্থ লয়ে বহু বিসংবাদ
আদি কাল হতে চলে ;
কেন মোরা বেঁচে থাকি
সে কথার উত্তর কে বলে !

তবু মোরা বেঁচে থাকি
নিদারুণ বাঁচার আগ্রহে ;
নিরন্তর সম কিম্বা অসম বিগ্রহে
লিপ্ত হই ,
ইহা ভাল উহা মন্দ কই ;
স্বদেশের স্বজাতির স্নেহে
অন্য দেশ ধ্বংস করি ;
অগ্নি জ্বালি অপরের গেহে ;
'আয়, আয়' বলে লোক ডাকি
নিজ গৃহে অগ্নি-স্পর্শ হলে ,
মিলিয়া সকলে
এক দিক ভেঙে ফেলি অন্য দিক গড়ি ;
আপনার মতবাদ মণ্ডনের তরে
অন্য মত খণ্ড খণ্ড করি
মহাদম্ভে তালপত্র ভরি

শ্যাম বলে, 'বড় দুখে আছি,
নুন-ভাত জোটে না'ক তাও ;
রাম খায় কালিয়া পোলাও ;
যদু চড়ে গাড়ি,
চলে তাড়াতাড়ি
আমাদের গায়ে কাদা দিয়ে।'
যদু বলে, 'দুর্ভাবনায়
সারা রাত জেগে কেটে যায় ;
সিলিংএর পানে রহি চাহি,
নতুন ষ্টাইলে গড়া বাড়ী
গণিব যে কড়িকাঠ নাহি ;
এবারের ট্রান্‌জ্যাক্‌সন
ফেল হলে দেউলে হবার
দরখাস্তের নিতে হবে একান্ত শরণ'।

শুধু ক্ষণিকের সুখ ;
এক ক্ষণ হ'তে আর ক্ষণে
শুধু আগাইয়া চলা :
এক দীপ হতে শুধু আর দীপ জ্বালা ;
নানাবর্ণ কাচ দিয়ে নানা বর্ণে এ জগৎ দেখা—
প্রতিটি মুহূর্তে যার ভিন্ন ভিন্ন রূপ,
কভু সাদা কভু কাল, ছায়া আর ধূপ !
অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা-লাভ,
কিম্বা সে বিড়ীতে এক টান,
হরে দরে একই কথা
বুঝেছিলে পাণ্ডুরং তুমি জ্ঞানবান্।

জন-স্রোতে

বেশ ভাল লাগে
লোকের ভীড়ের মধ্যে মিশে বেড়াতে—
যদি না থাকে
নেহাৎ বুকে পিঠে চাপাচাপি ।
লোকের ভীড় !
কত রকমের কত লোক ।
কত রকম তাদের পোষাক ;
কেউ বা লম্বা, কেউ বা বেঁটে ;
কেউ বা কাল, কেউ বা ফর্সা, কেউ বা মাঝারি
চলেছে সবাই কত রকম কাজে
নিত্য এবং নৈমিত্তিক ।
অনেকেরই উদ্দেশ্য সাধু ;
কেউ বা অসাধু—পকেটে নিয়ে কাঁচি ।
কেউ চলেছে কাউকে অন্বেষণ ক'রে ;
কেউ বা চলেছে কাউকে এড়িয়ে ।

তবুও
সব মিলিয়ে এই জন-স্রোত এক ।
এই বৃহৎ একের মধ্যে মিশে গিয়ে
আমি অনুভব করি
তা'দের সেই একীভূত সমগ্র সত্তা ;
তা'দের গতি-পথের প্রাণ-স্পন্দন !
আর মনে করি
ভাগ্যিস্ আমি নই জনতা-জানিত মহাপুরুষ !

তা' হলে
নিমিষে এই জঙ্গম ভীড়
স্থাবরত্ব প্রাপ্ত হয়ে
আমার চার পাশে জমে উঠ্‌ত
এক বিরাট কুৎসিত মহাপিণ্ডের নিশ্চলতায়!

ফুটপাথে

প্রকাণ্ড বড় সহরের ফুটপাথ;
রাস্তার দু'পাশ দিয়ে
মানুষ চলার রাস্তা।
মাঝখান দিয়ে চলে
গাড়ী, ঘোড়া, ট্রাম, বাস, সৌখিন মোটরকার।
ফুটপাথের পাশে বাড়ী—
দোতলা, তেতলা, চারতলা,
এবং বহু-তলা স্কাই-স্ক্রেপার—
সেখানে সুখে বাস করবার জন্য
নানা বন্দোবস্ত—
লিফ্‌ট, এলিভেটর, হিটিং-কুলিং এপারেটস।

তবুও
মানুষ মানে না কোন ব্যবস্থা;
বলে, ব্যবস্থা মান্‌তে গেলে চলে না।

চলে রাস্তার মাঝখান দিয়ে,
পাশ দিয়ে ;
বেজায়গায় করে রাস্তা-পারাপার।
ফলে
পড়ে গাড়ী-চাপা, কাটে হাত পা, যায় প্রাণ।
তবুও চলে পূর্ববৎ ;
এবং
খবরের কাগজে রোজ বেরোয় খবর।

এদিকে আবার
চলার ফুটপাথে
বসে ছোটখাট দোকান—
ফুলের দোকান, ফলের দোকান,
শাক-সব্জির দোকান,
খাবারের দোকান, কাম-মুচি, তালা-চাবি-সারা
ইত্যাদি আরও অনেক কিছু।
হল্লা আসে ;
নিমিষে দোকানপাট উঠে যায় ;
হল্লা চলে যায় ;
আবার দোকান বসে—
সমুদ্রের ঢেউএর যেন আনা-গোনা !

তা'র পর রাত্রি আসে ;
সহরের বুকে
কৃষ্ণপক্ষ শুক্লপক্ষ সবই সমান ;
তবুও রাত্রি আসে।

তখন
শহরের সেই হর্ম্য, প্রাসাদ, সৌধ, বেশ, নিষদ্যা,
উপকার্য, গুঞ্জা, প্রপা, চৈত্য, চতুঃশালা
সব কিছু ছাপিয়ে নেমে আসে
আর এক বিপুল জন-স্রোত
এই ফুটপাথে,
অলিতে গলিতে, সদর রাস্তায়,
এবং সদর স্ট্রীটে—
যেখানে কবিগুরুর প্রথম হয়েছিল ব্রহ্মানুভূতি—
সর্বত্রই এই সমান ব্যবস্থা।
সেখানে চলে
কর্মক্লান্ত দিনের বিশ্রাম,
চলে সৃষ্টির লীলা,
চলে আলোকের বাধা-মুক্ত পাপের প্রবাহ।

একদিকে আইন করা,
আর দিকে আইন ভাঙার পালা!
আইন ক'রে মানুষকে ভাল করা যায় না,
দুঃখ ক'রে বলেন আধুনিক স্মার্ত পণ্ডিত।

———

কাশীর বুড়ী

বুড়ী বেঁকে নুয়ে পড়েছে ,
একদিন বুড়ীর রং ছিল ফর্সা,
আজ তা' ময়লা তামাটে ।
অনাদিকাল থেকে
চারটি ক'রে টাকা আসে মাসে মাসে
বুড়ীর দেশ থেকে ।
টাকা আসবার নির্ধারিত সময়ের
ছ'চার দিন আগে
বুড়ীর মুখে দেখা দেয় একটু শঙ্কিত চঞ্চলতা ;
হয়ত তা'রা টাকাটা আর পাঠাবে না !
তবুও টাকাটা আসে ;
কেন না এই পৃথিবী ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত ;
পাঠশালার পণ্ডিত মহাশয় বলেন,
ধৃ-ধাতু থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে ধর্ম-শব্দ ।
আগে টাকার সঙ্গে মনিঅর্ডারের কুপনে
থাকত খবরাখবর,
এখন তা' আর থাকে না ।
দীর্ঘদিনে আর এক পইটে তফাৎ হয়ে গিয়েছে
ভাইপোদের স্থান এখন নিয়েছে
পৌত্রের দল ।
তা'রা অনেকেই বুড়ীকে দেখেনি ।

আগে বুড়ী অনেক বেড়াত ;
সকালে স্নান করে
এ ঠাকুর ও ঠাকুর, সে ঠাকুর দেখে
ছুপুরে বাড়ী ফিরে রান্না চড়াত।

এক বেলা রান্না ;
একটু বেলায় খেলে
কি জানি কেন
রাত্রে ঘুমটা হয় ভাল।
হাসিখুসির গল্পে
সমবয়সিনীদের সঙ্গে
পুণ্য-লোভী বুড়ী রাস্তা হাটত
অনেকটা নিজের অজ্ঞাতে।

আজ বুড়ী বেঁকে নুঁয়ে পড়েছে ;
চোখেও ভাল ঠাওর হয় না ;
সমবয়সিনীদের অনেককেই
বাবা বিশ্বনাথ ঠাঁই দিয়েছেন চরণে।
ছু'চার জন যারা আছে
তা'দেরও আর
বড় দেখতে পাওয়া যায় না পথে-ঘাটে।
খানিক বেলায় ভিড় কমলে
আজকাল বুড়ী আসে
গঙ্গা স্নানে একলা।
অনেকদিনের অভ্যাস হলেও
উঠা-নামায় আজকাল কষ্ট হয়।

বুড়ী কোন দিন রাঁধে কোন দিন রাঁধে না ;
এটা-ওটা খেয়েই কাটিয়ে দেয় ;
তা'তে আজকাল রাত্রে ঘুমের ব্যাঘাত হয় না ;
বাবা বিশ্বনাথের আশীর্বাদ বলতে হবে !

প্রকৃতির রাজ্যে
বুড়ীর জৈব-প্রয়োজনের পালা
শেষ হয়ে গেছে অনেক কাল আগে।
কারণাতিশায়ী অনাদিনাথ বিশ্বনাথ
মন্দিরে বসে আছেন অকারণে—
বেদান্তের ভাষায় যাকে বলে লীলাকৈবল্যম্।
আর এই কারণানুগা কাশীর বুড়ী
বেঁচে আছে তেমনি অকারণে
তা'র তিরোধানপর্বটুকুর অপেক্ষায়।

তবুও কেমন যেন মনে হয়,
এই বুড়ীর জীব-লীলার রঙের ছোঁয়াচটুকু
লেগে আছে
আমাদের সবারই জীবনে ;
বুড়ী না থাকলে
আমাদের জীবন যেন হ'ত
অলক্ষিত রকমে একটু অন্য রকম !

ব্রুনো

[ব্রুনো মধ্যযুগের ইটালী দেশের দার্শনিক। ইঁহার মতবাদ অনেকটা আমাদের দেশের অদ্বৈতবাদের মত ছিল। ফলে সে যুগের গোঁড়া পাদ্রীর দল তাঁহাকে সমস্ত জীবন দেশ হইতে দেশান্তরে তাড়া করিয়া বেড়ায় এবং অবশেষে হস্তগত করিয়া "যথাসম্ভব কারুণ্যের সহিত এবং বিনা রক্তপাতে" অর্থাৎ জীবন্তে পুড়াইয়া মারে।]

মধ্যযুগের অন্ধকারের মাঝে
তুমি জ্বালি দীপশিখা
এ দেশ হইতে ও দেশে ফিরেছ,
মেলেনি কোথাও মাথা রাখিবার ঠাঁই

তুমি বলেছিলে
ভগবান নাই বসিয়া সিংহাসনে
রক্তচক্ষু লাঠিটি ঘাগায়ে হাতে ;
তুমি বলেছিলে তিনি সবখানে
আর সব কিছু তিনি।

এ কথা আমরা বুঝি কেহ কেহ
দেশে ও বিদেশে অনেক দিনের পরে।

———

হাসি

হাসপাতালে শুয়ে আছি ;
ডাক্তার বলেছেন সব কিছুর পরীক্ষা কর্তে হবে।
প্রকাণ্ড একটা ঘর ঃ
সারি সারি লোহার খাটিয়ায় শোয়া রোগী।
ঘরটা সবই কালাজ্বরের রোগীতে ভরা।
স্বভাবতই তারা কাল রঙের
সমাজের নিম্নস্তরের লোক ;
জীবন-যুদ্ধে ক্লান্ত উৎপীড়িত দৈন্য-দগ্ধ
আজ তারা পীড়িত হয়ে নিয়েছে হাসপাতালে শয্যা

আমি অনেক সুশ্রী নরনারী দেখেছি ;
তার মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর সুশ্রী যাদের দেখেছি
তা'দের মধ্যে অনেকগুলিরই রঙ কাল।
অথচ কি সুন্দর সে কাল রঙ ;
তাদের দেখলে বুঝা যায়
কেন মহাযানী বৌদ্ধেরা
অমিতাভ বুদ্ধের কল্পনা করেছেন
কাল রঙে।
অথচ এরা !
এরা যে কি রকম কাল তা' বলা যায় না।
বিশ্রী বললে ঠিক বলা হয় না ;

কেন না
প্রত্যেক বিশ্রী জিনিষের মধ্যে আছে
একটা উগ্রতা,
অন্যকে আঘাত করার একটা প্রবৃত্তি।
একটা অতি রুক্ষ শ্রীহীন প্রাণহীন
অসহায় রকমের কাল এরা।
এদের দেখে
রোগ-ক্লিষ্ট খারাপ মন হয়ে গেল আরও খারাপ।
ঘরের মধ্যে 'ট্রিপডের' উপর বসান ছিল
একটা বড় এ্যাস্‌পারাগ্যাস :
প্রায় সমস্ত দিন চেয়ে রইলাম
সেইটার দিকে।
এত মানুষের মধ্যে থেকেও
মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কাটল
সারাটা দিন।

হঠাৎ এক সময়ে—
কি করে কি হল জানি না—
তা'দের মধ্যে একজনের মুখে
ফুটে উঠল হাসি।
দাঁতগুলো খুব পরিষ্কার নয় ;
তবুও সে হাসি সত্যিকারের হাসি।
মনে হল
হঠাৎ যেন
দীর্ঘ অন্ধকার বর্ষাদিনের শেষে
পৃথিবী আবার আলোয় আলো হ'য়ে উঠেছে।

সেই পরম ক্ষণে—
আমি আবিষ্কার করলাম সেই মানুষটিকে
তা'র সত্য মূর্তিতে,
তা'র অমর অক্ষয় মানুষের মূর্তিতে ;
সৃষ্টির মধ্যে যা'র থেকে বড় আর কিছুই নেই।
বুঝলাম এরা এখনও সেই মানুষ ;
বাহিরের এই রুগ্ন ক্লিষ্ট শ্রীহীন মূর্তির তলেও
এখনও এরা মানুষ ;
এদের এখনও সব কিছুই আছে
বুঝলাম মানুষ যত দিন বেঁচে থাকে
ততদিনই সে পরিপূর্ণ মানুষ
ভালমন্দ সকল অবস্থার মধ্যেই ;
তারপর··
তারপর সে অপরান্ত-চিন্তা নিতান্ত নিষ্ফল !

সেই মুহূর্তে তারা এসে গেল আমার দলে,
আমিও এসে গেলুম তাদের দলে ;
সেই মুহূর্ত থেকে আমি হলুম
তা'দের একজন ;
ঘরে আমি আর একা নই !

আজিকার এই 'ক্লাস'-দীর্ণ জগতে
আমি তাদের থেকে উঁচু ক্লাসের লোক।
দু'দিন পরে আমি চলে গেলাম অন্য ঘরে—
সেখানকার ব্যবস্থা সব আলাদা।

তবুও
সেদিন জীবনে পরিপূর্ণভাবে বুঝেছিলাম
হাসির শক্তি ;
সেদিন বুঝেছিলাম
কেন মানুষ ছাড়া অন্য জীবে হাসতে পারে না।

———

পাঞ্চজন্য-সংবাদ

[আমরা পুরাতন পুঁথির অনুসন্ধান করিতে করিতে বাঁকুড়া জেলার এক পল্লীতে একখানি খণ্ডিত পুঁথির এক অংশে এই পালাটি পাইয়াছিলাম। পালাটি খুব পুরাতন হওয়াই সম্ভব। তবে পালাটি নকল করিবার পর পুঁথিখানি হারাইয়া যাওয়ায় সে আলোচনা আর সম্ভব নয়। পুঁথি এরূপ হারাইয়া যাওয়া প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের গবেষণার ইতিহাসে একেবারে নূতন ব্যাপার নয়।]

পঞ্চজন নামে এক আছিল অসুর
মহাপরাক্রান্ত বীর সংগ্রামের শূর।
দিলেক অনেক বার স্বর্গপুরে হানা ;
হরিল অনেক ধন, দেবপত্নী নানা।
নন্দনকানন ভাঙ্গি কৈল মেচমার ;
এইরূপে দেবে দুঃখ দিলেক অপার।
তবে যত দেবগণ একত্র হইয়া
বিষ্ণুর নিকটে দণ্ডাইল বার দিয়া।
কহিলেক সমস্বরে, শুন, হে গোঁসাই !
তুমি'ত আনন্দে আছ, আমরা যে যাই।

পঞ্চজন দৈত্য আসি করে মহামার।
যুদ্ধে হারাইয়া দুঃখ দিতেছে অপার।
কার পত্নী কাড়ি লয় কার বা বাহন ;
সহস্রাক্ষ মুদে আছে সহস্র নয়ন।
শিববর পাইয়া দৈত্য হইল প্রবল,
অস্ত্রের অভেদ্য বীর সংগ্রামে অটল।
দেবের বিপত্তিকালে তুমিই আশ্রয়,
অতএব বিহিত করহ মহাশয়!

শুনিয়া গম্ভীর মুখে কহেন রমেশ
নারদের মুখে আমি শুনেছি বিশেষ।
অতীব দুর্বার এই দৈত্য দুরাচার
দেবনরে নিত্য দুঃখ দিতেছে অপার।
স্বল্পেতে সন্তুষ্ট দেব ভোলা মহেশ্বর
খুসী হইয়া বর দিতে সর্বদা তৎপর ;
সিদ্ধি খেলে বুদ্ধি যায় শাস্ত্রেতে কয়েছে।
আরও কিছু দিন দুঃখ করুন বহন,
কৃষ্ণ-অবতারে দৈত্যে করিব নিধন।

অতঃপর কৃষ্ণ জন্মিলেন মথুরায়,
দেবলোকে-মহানন্দ, সবে গান গায়।
যথাকালে দৈত্য সনে বাঁধিলেক রণ,
আকাশেতে পুষ্প-বৃষ্টি করে দেবগণ।
পরম দুর্মদ দৈত্য শৌর্যে মহাকাল,
শিবদত্ত ছিল তা'র ইস্পাতের ঢাল।

ঢালে ঠেকি সুদর্শন চক্র ফিরে আসে,
দেবলোকে চোখে জল, দৈত্যলোক হাসে।
ঢালে ঠেকি ভোঁতা হয়ে আসে বাহুড়িয়া,
বিশ্বকর্মা প্রতিবার দেন শাণ দিয়া।
ইন্দ্রচন্দ্র তাহা দেখি উদ্বেগে আকুল,
ঘষিতে ঘষিতে ঢেঁকী হয় যে নির্মূল।
অবশেষে দেবগণ অনেক চিন্তিয়া
শিবের নিকটে উপনীত হইল গিয়া।

কহিলেক, জয়, শিবশম্ভু মহেশ্বর!
নেশা ছাড়ি কিছুক্ষণ হউন তৎপর।
এত বলি কহে সবে সমস্ত কাহিনী,
শুনিয়া চিন্তিত শম্ভু হলেন আপনি।
অতঃপর কৃষ্ণসনে করি অনুমান
দুইজনে রচিলেন বড় এক প্লান।
অতঃ শম্ভু মায়াজাল করিয়া রচন
দৈত্যের সকল বুদ্ধি করেন হরণ।
কোথা গেল রণস্থল, কোথা সৈন্যদল,
সম্মুখেতে সিন্ধুবেলা জল টলমল।
সিন্ধুকূলে দাঁড়াইয়া মোহিনী সুন্দরী
পঞ্চজনে ডাকি বলে এস ত্বরা করি,
রণশ্রমে ক্লান্ত তুমি এবে খাও সুধা,
আর খাও শূল্য মাংস, দূর হবে ক্ষুধা।
শুনি দৈত্য হইলেক মহা হরষিত,
ছাড়ি ঢাল অস্ত্র-শস্ত্র বসিল ত্বরিত।

সুধাপাত্র মুখে নিতে উঠিলেক ঝড়,
আকাশ ভাঙ্গিয়া বাজ পড়ে কড় কড়।
সহসা আসিল এক ঢেউ মহাকায়,
যুদ্ধ-ঢাল অস্ত্র-শস্ত্র কোথা ভেসে যায়।
অমনি হঠাৎ কৃষ্ণ হয়ে আবির্ভূত
চক্রহাতে দৈত্য-শির কাটেন ত্বরিত।
দৈত্য-লোকে হায় হায় ; হাসে দেবগণ,
দুন্দুভি বাজায় করে পুষ্প বরিষণ।

দৈত্য মৈল তবু কৃষ্ণ ন'ন হরষিত,
এ যুদ্ধে সম্মান তার হয়েছে বাধিত।
শিবের সাহায্য বিনা না হইল জয়
এ কথা ভাবিতে মনে ক্রোধ উপজয়।
ক্রোধে বিশ্বকর্মা প্রভু করেন স্মরণ,
দণ্ডাইল বিশ্বকর্মা বন্দিয়া চরণ।
কৃষ্ণ ক'ন হে কর্মী, এ দৈত্য দুরাচার
দেবনর সবে দুঃখ দিয়াছে অপার।
দেহ-অস্থি লয়ে এর শঙ্খ গড়ি দেহ,
রণস্থলে বাজাইব, যাবে এ সন্দেহ
বেঁচে পুনঃ আছে কি না দুষ্ট দুরাচার,
দেবের ঘুচিবে ত্রাস, আনন্দ অপার
লভিবে কিন্নর যক্ষ মানুষের গণ ;
শত্রুর হইবে ভয়ে হৃদয়-কম্পন।

সেই হতে পাঞ্চজন্য শ্রীকৃষ্ণের শাঁখ
সকল শাস্ত্রেতে যার অতিশয় জাঁক।

সে আদর্শ নরকুলে বহু লোকে মানে,
খুঁড়িয়া শত্রুর গোর দেহ ধরি টানে,
ফাঁসীতে ঝুলায় কিম্বা আগুনে পুড়ায়,
হাতীর লাঙ্গুলে বাঁধি নগরে ঘুরায়
মৃতদেহ লভি কেহ কেহ গুলি করে,
কেহ লাথি মারে, কেহ মুখে ঘাস ভরে।
এইরূপে যা'তে যা'র ক্রোধ শান্তি পায়
দেবের চরিত কর্ম নরেতে জুয়ায়।
পাঞ্চজন্য পালা এই অপূর্ব কথন
ব্রাহ্মণে শুনিলে হয় বিদগ্ধ সজ্জন,
ক্ষত্রিয় শুনিলে হয় পৃথিবীর পতি,
বৈশ্য শুনি ব্যবসায়ে লভয়ে উন্নতি।
শূদ্রও মহত্ত্ব পায় শুনি এ সংবাদ,
মিটে যায় যার যত পুরানো বিবাদ।
দেহ-অন্তে স্বশরীরে স্বর্গে চলি যায়,
শিব মুখ্য করি ভণে পালা হইল সায়।

শশধর তর্কচূড়ামণি

ফাঁকতালে অমরত্ব পেলে, চূড়ামণি !
এ সৌভাগ্য এ জগতে একান্ত দুর্লভ।
মরিয়া হয়েছে ভূত অথবা শ্বসিছে
নাভিশ্বাসে যাহা কিছু, জীয়াতে তাদের
বৈদ্যুতিক তুকতাক করি আয়োজন
অনেক বক্তৃতা দিলে—সকলি নিষ্ফল !
তবু আজ আমাদের নবযুগ-কথা
আমাদের রেণেসাঁস গত শতাব্দীর
শেষভাগে কেহ যদি তা'র পরিচয়
দিতে কিংবা নিতে চায় অবশ্য তাহাকে
বিস্তারে জানিতে হবে অন্য কথা সহ
তোমার কাহিনী কীর্তি ওহে ভাগ্যবান !

২

তবু যেন মনে হয় তর্কচূড়ামণি !
আবার এসেছ তুমি বেঁচে মন্ত্রবলে
সঙ্গে নিয়ে পাঁজি-পুথি আরও বেশী ক'রে
আরও দলবলসহ। অনেক স্বামীজী,
বহু মঠ, বহু টাকা, বহু ভক্তদল
তোমারে রয়েছে ঘিরে ; পাকা ট্রেঞ্চ কেটে
এবারে বসেছ তুমি ; তোমারে নাড়াতে
এবারে পোড়াতে হবে বহু কাঠ খড়।
সে বারে সরষে ছিল খাঁটি নির্ভেজাল,
এবারে সরষের মধ্যে ঢুকে আছে ভূত।
সে ভূত ভূতুড়ে কাণ্ড বাধাবে অনেক
যুক্তি আর অযুক্তিতে পাকাইয়া জট।

জীবন পাড়ুই

(সত্য ঘটনা অবলম্বনে)

বেঁচে গেছে জীবন পাড়ুই বলছে পাড়ার লোকে,
একটু শান্তি একটু তৃপ্তি যেন তাদের চোখে।

কাগজেতে দেয়নি সে খবর,
ব্যাপারটা'ত নয়'ক মোটেই জবর,
এমন ব্যাপার নিত্যই'ত ঘটে,
ছোট্ট লোকের দুঃখ সুখের কথা
ছোট্ট পাড়ায় শুধুই কেবল রটে,
একটি কিংবা দু'টি দিনের তরে।

পাড়ায় কিন্তু জানে ঘরে ঘরে
জীবন পাড়ুই ওস্তাদ মিস্তিরি।
হাতের কাজে ছিল তাহার নাম,
জীবন পাড়ুই জানত সেটা।
তাহার গুণগ্রাম
গাই'ত তাহার চেলা চামুণ্ডারা।

জীবন পাড়ুই ওস্তাদ মিস্তিরি,
ছিল তাহার একটি পুত্র,
বিয়ে-করা ছিল এক ইস্তিরী।

হাতের কাজের ডিউটি সারা করে
সন্ধ্যাবেলা একটু আধটু না টানলে কি চলে!
জীবন পাড়ুই টানত একটু বেশী
পাড়ায় আজও সকল লোকে বলে।
দ্বিতীয় টান, তাও সে একটু ছিল;
ও সব লোকের ওটা ঘটেই থাকে:
ঠগ বাছতে উজাড় হবে গ্রাম,
কা'কে ছেড়ে ধররে তুমি কা'কে!
তবু কিন্তু বুড়ীর প্রতি তার
ছিল সদাই টান;
মাইনে পেলে বড় একটা মাছ
চওড়া-পেড়ে নতুন শাড়ীখান
আনতো কিনে।
তবে কিন্তু টানত যে দিন বেশী
সে দিন হয়ত রুটিনটা ঠিক থাকত না'ক আর।

সে দিন এলোকেশী
তা'র বদলে পেত পিঠে কিছু,
সই'ত সে সব মাথা করে নীচু।
অবশ্য সে কাঁদত খানিক, ফেলত চোখের জল,
এবং রেগে বলত' যে সব বচন
লেখায় তাহা যায় না করা রচন।
তবু কিন্তু মনে মনে বুঝত এলোকেশী
পুরুষরা সব এমনি হয়েই থাকে;
জীবন পাড়ুই নয়'ক মোটেই বেশী
সংসারে তা'র আছে খর টান।

বয়স যখন পনের কি ষোল এরূপ অনুমান,
ছেলেটাকে ঢুকিয়ে দিল কাজে;
সবাই বলে সেটা ছিল বাপের মতই দড়।
তা'র পরেতে হলে একটু বড়
বিয়ে দিয়ে আনল ঘরে বউ।
সবাই বলে বউটি সুলক্ষণা;
বউ-এর কথা উঠলে পরে বুড়ী কিন্তু হ'ত অন্যমনা।
জীবন কিন্তু বদলে গেল অনেক,
বেঁচে গেল এলোকেশীর পিঠ;
ব'লত সবাই, 'পুতের বউ এনে
বুড়ো এবার হয়েছে খুব ঢিট'।

তা'র পরেতে গেল কিছু দিন,
এলোকেশীর হ'ল স্বর্গবাস;
সংসারেতে কে আর বল বসে
চিরদিনই কাটে ঘোড়ার ঘাস।
জীবন পাড়ুই মুশড়ে গেল বড়,
দু'তিন দিন বেরুইনি'ক কাজে;
তা'র পরেতে আবার হাজির হল,
বসে থাকা ক'দিন বল সাজে।
তা'র পরেতে অনেক ঘটা করে
এলোকেশীর শ্রাদ্ধ করলে বুড়ো,
'ছেলের হাতে পিণ্ডি পেয়ে স্বর্গে গেল বুড়ী'
বল্লে অগ্রদানী মাধব খুড়ো।

তা'র পরেতে গেল কিছু দিন ;
এক দিন'ত কেমন গ্রহের দোষে
জীবন পাড়ুই চক্ষে আঘাত পেয়ে
একেবারে হল কাজের বার ;
কাজ খুইয়ে রইল ঘরে বসে।
সবাই বলে বুড়ীর পুণ্যে সবই,
বুড়ীর সঙ্গে ডুবল এ সংসার।
অলক্ষ্মী ঐ পুতের বউটা এসে
পাপের ফলে করবে ছারখার।

তা'র পরেতে গেল কিছু দিন,
ছেলেটাকে ধরল কি এক রোগে ;
দিনকে-দিনে কাশি বাড়ে, ওজন কমে যায়,
ঘুস-ঘুসে এক জ্বরে কেবল ভোগে।
এমনি করে গেল বছর খানেক,
তা'র পরে শেষ করে দুঃখ-শোক
ধনে প্রাণে বাপকে মেরে যাত্রা করল সোজা
সেই দেশেতে, যেখান থেকে ফিরে না আর লোক।
দু'পাঁচ দিন না যেতে যেতে বউটা হল হাওয়া ;
কেউ জানে না কোথায় গেল চলে।
দু'চার জনে বলাবলি করে,
'আমরা জানি, কিন্তু
কিবা হবে সে কথা আর বলে'।

জীবন পাড়ুই দু'খানা ঘর ছেড়ে
একটা ঘরে রইল ভাড়া করে ;

দিনের বেলা রান্না করে,
রাতের বেলা হয় না খিদে বলে
খায়না কিছু,
পড়ে থাকে একলা আঁধার ঘরে।
তা'র পরেতে রেস্ত এল কমে,
প্রমোশন তার হল বারান্দায়,
বাড়ীওয়ালা করল সেটা ঠিক
দরমা দিয়ে ঘরামী ঘর বানায়।
অনেক দিনের ভাড়াটে সে,
বাড়ীওয়ালা চায় না'ক আর ভাড়া ;
মুখে বল্লে, 'যখন পার দিও,
এর জন্যে নেই'ক কোন তাড়া'।
জীবন পাড়ুই সে দিন নাকি খুব
কেঁদেছিল ছেলের নামটি ধরে।
পাড়ার লোক বল্লে, 'রোখা লোক,
মাথা হ'ল নীচু, সেই দুঃখেই কান্নাকাটি করে।'

তা'র পরেতে গেল কিছু দিন,
কাশি সর্দি, তাইতে জীবন ভোগে ;
বৃদ্ধকালের সর্দি সেটা—কি আর করা যাবে ;
কে বল আর বদ্যি ডাকে ছোটখাট এমনতর রোগে।
সর্দি এবং গলার ব্যথা, ঢোক গিলতে লাগে,
মুখ দে' ওঠে জল,
গলার ব্যথা বেড়েই চলে ক্রমে ;
জীবন বলে, 'আমার মনে হয়
এইবারেতে ধরেছে ঠিক যমে।'

পাড়ার লোকে ভরসা দিয়ে বলে,
গলার ব্যথায় মরে না'ক লোক।
বলে গেল বৈদ্যনাথের ছেলে,
'সেরে যাবে
বচ আর যষ্টিমধু, মিশ্রী দিয়ে পাঁচন করে খেলে।'

এমনি করে চলল কিছু দিন,
চেলারা সব মাঝে মধ্যে আসে,
তাদের দেওয়ায় কষ্টে সৃষ্টে চলে ;
জীবন পাড়ুই মাথায় হাত দে' বলে,
'একশ' বছর পেরমাই তোদের হোক,
তোদের কাঁধে চড়ে আমি ভুলব ছেলের শোক।'

তা'র পরেতে সকালে এক দিন,
পাড়ার একটি মেয়ে
ঢুকল ঘরে যষ্টিমধুর পাঁচনটুকু রেঁধে ;
জীবন বুড়োর মুখের দিকে চেয়ে
হঠাৎ কেমন চেঁচিয়ে উঠল কেঁদে।
মেয়েরা সব ছুটে এল ফেলে ঘরে পাট,
দেখল নেড়ে চেড়ে
জীবন পাড়ুই অনেকক্ষণ মরে হয়ে আছে কাঠ।

বেঁচে গেল জীবন পাড়ুই বলে পাড়ার লোকে,
একটু শান্তি একটু তৃপ্তি যেন সবার চোখে

হে আমার হৃৎপিণ্ড

হে আমার হৃৎপিণ্ড !
সে কালের কবিদের ভাষায় বলি,
"সাবাসি তোমারে"।
ছেষট্টি বছর আগে
একদিন কান্নার সঙ্গে সুরু করেছিলে ওই চলা—
লব্‌ডপ্‌ লব্‌ডপ্‌ লব্‌ডপ্‌ !
আজও চলেছে ;
ক্যাজুয়াল লিভ নেই, গেজেটেড হলিডে নেই,
টিফিনের রিসেস্‌ নেই,
দিন নেই রাত্রি নেই ক্ষণ নেই অক্ষণ নেই
অশ্লেষা নেই মঘা নেই ত্র্যহস্পর্শ নেই।
অবিরাম অবিচ্ছেদ তোমার চলার চাকরি—
লব্‌ডপ্‌ লব্‌ডপ্‌ লব্‌ডপ্‌ !
এই যে এত আস্ফালন,
তত্ত্বমসি নিয়ে এত বিচার,
বই পড়া, কবিতা লেখা,
সব কিছুরই মূলে ওই লব্‌ডপ্‌ লব্‌ডপ্‌ লব্‌ডপ্‌ !
কেইবা চালায়, আর কেনই বা চলে !
তা'র পর একদিন শেষ হবে এই চলা
অন্য লোকদের কান্নার মাঝখানে।
'তখন জমবে ধুলা তানপুরাটার তারগুলায়' ;
তখন বইগুলো কাটবে উঁইয়ে আর ইঁদুরে
ভাগাভাগি করে।

আর হয়তো বা
অবশিষ্ট কবিতার বইগুলো যাবে বেনের দোকানে,
আর সেখানে তা'দের দিয়ে হবে মশলা বাঁধা,
আর প্রমাণ হবে কবিতারও আছে ইউটিলিটি।
মোটের উপর সবকিছুরই মূলে তোমার ওই চলা,
লব্‌ডপ্‌ লব্‌ডপ্‌ লব্‌ডপ্‌!

———

আত্মারাম শর্মার আত্মজবীনী

একদিন জন্মেছিলে আট পাউণ্ড দেহখানি নিয়ে
একজনকে বহু দুঃখ দিয়ে।
ছিল চোখ ছিল কান নাক,
অথচ বেবাক
তাদের ছিল না ক্রিয়া;
অসমবদ্ধ ছিল তারা বিষয়ের সহ;
তার পর অহরহ
নানান চেষ্টার ফলে হ'ল কার্যকরী
তারা সব।
ক্রমে ক্রমে জীবনের বাড়িল গৌরব।
ছয় ফুট দেহ নিয়ে চলেছ রাস্তায়
লোক দেখে পিছু ফিরে চায়।
পড়িলে অনেক গ্রন্থ আহরণ করি বহু জ্ঞান,
মিত্রপক্ষ প্রশংশিল শত্রুপক্ষ হিংসা-ম্রিয়মাণ।

খেলিলে ফুটবল হকি, লিখিলে কবিতা,
সভায় বক্তৃতা দিলে
মুগ্ধ লোক এক মনে শুনিল সবি-তা।

তার পর ক্রমে বলহীন,
হ'লে বৃদ্ধ হ'লে কান্তিহীন।
এত দিন পাশে ছিল যেই
আজ সেও নাই ;
যাবার সময় গেল বলে,
'শেষ বাজী আমারই তা'হলে,
আগে যাই।'
ডাক্তারের কনসলটেসনের মুখে
বুঝেছ হয়েছে ক্যানসার বাঁ দিকের লাঙসটাতে।
পঞ্চাঙ্কের শেষ দৃশ্য আজ উপস্থিত ;
মাথায় বালিশ দিয়ে শুয়ে থাক
কভু কাৎ কভু হয়ে চিৎ।
একজনে দুঃখ দিয়ে ভবধামে হলে অবতার
কিঞ্চিৎ দুঃখের মাঝে আজ কর লীলার সংহার।
জেন তবে এ ব্যাপারে তুমি একা নয় ;
উত্তর হবে না দিতে—
শেষ বাণী দেবার ফ্যাসন আর নেই—
এখন এসেছে দিন কথা না বলার,
চুপচাপ রও।

এইটুকু জেনে যাও আরও পাঁচ জনের মতন
তুমিও রাখিয়া গেলে কিছু
জীবনের মহাস্রোত করিতে রচন।

সাঁওতালী গান

[সাঁওতালী ভাষার গান। বিবাহান্তে বধূ যখন প্রথম শ্বশুর-গৃহে আসে তখন তাহাকে অভিনন্দিত করিয়া এই গান গাওয়া হয়। মারাড় ফুল পারিজাত ফুলের ন্যায় একটি কাল্পনিক অথচ বহু-কাঙ্ক্ষিত ফুল।]

আগে বল'ত লোকে
ফোটে মারাড় ফুল
অনেক অনেক উঁচু পাহাড়ের গায় ;
এখন দেখছি চেয়ে
সে ফুল ফুটেছে
আমাদের গাঁয়ের এই ছোট্ট পাড়ায়।

গান

[সুর—'আজু বৃজমে হরি হোরী মচাই' ইত্যাদি প্রসিদ্ধ হিন্দী গান]

আজি ফাগুন-ভরা ব্রজ-পুর,
যমুনা কলকল,
দু'কূল উছল,
নাচত মত্ত ময়ুর।

মধুপ-গুঞ্জর—মুখর সব বন
মত্ত-বাঁশরী—মঞ্জুরিত মন,
হোরি খেলত হরি
ব্রজ-অঙ্গন ভরি
গোপী সহ রস-রঙ্গ-মধুর।

মোহ-মুদ্গর

[বাইবেল ; ইক্লাজিয়াসটেস, প্রথম অধ্যায়]

১। ভুল, সবই ভুল ;
ভ্রান্তি, সবই ভ্রান্তি, মোহ-ভ্রান্তি।

২। মানুষ খেটে মরে সমস্ত জীবন ;
কি লাভ ?

৩। এক দল মানুষ চলে যায়,
তারপর আসে আর এক দল ;
উদাসীন পৃথিবী শুধু ঘুরেই চলে।

৪। সূর্য উঠে, সূর্য ডুবে যায় ;
আবার উঠে আসে পরের দিন ;
পূবের আকাশ হয়ে উঠে ঠিক তেমনি রাঙা।

৫। বাতাস ছুটে চলেছে দক্ষিণ দিকে,
যা' দক্ষিণ তাই উত্তর ;
সেই বাতাসই বহে চলে উত্তরে ;
ছুটে চলে বাতাস তা'র অখণ্ড বৃত্তপথে।

৬ সমস্ত নদী পড়ছে গিয়ে সাগরে ;
তবুও
নাগ্নিস্তৃপ্যতি কাষ্ঠানাং ন পয়োসাং মহোদধিঃ ;
নিত্যকাল চলেছে জোয়ার-ভাঁটার খেলা।

৭। সব কিছুরই পিছনে আছে কষ্টের ইতিহাস ;
রূপ দেখে দেখে চোখে ক্লান্তি আসে ;
তৃপ্তি কই ?
তৃপ্তি কই শোনার মধ্যে !

৮। যা ছিল তা' আবার হবে ;
আজ যা করছি
কালও তাই করতে হবে ;
এই পুরানো জগতে নূতনের সম্ভাবনা কোথায় ।

৯। কেউ কি কখনো বলেছে,
'দেখ, এইটা নতুন' ;
সব কিছুই
আমাদের পূর্বপুরুষদের কৃতির পুনরাবৃত্তি ।

১০। যা হয়েছিল
তা'সব আজ বিস্মৃতির অতলে ;
এমনি করে মানুষ ভুলে যাবে
যা হচ্ছে আর যা হবে ।

১১। আমি আজ তোমাদের উপদেশ দিচ্ছি ;
আমি একদিন ছিলুম জেরুজালেমের রাজা ।

১২। আমি জানতে চেয়েছিলাম
আমাদের কৃতির সার্থকতা কি ;
মানুষ জানতে চায়,
এই হচ্ছে তার উপর ঈশ্বরের অভিসম্পাৎ ।

১৩। আমি একে একে দেখেছি
মানুষ কি করে—কত কি, কত রকম !
সবই ভ্রান্তি, মোহ-ভ্রান্তি,
সবই আত্মার বিড়ম্বনা ।

১৪। যা বাঁকা তা'কে সোজা করা যায় না,
যা নেই তা'কে হিসাবের মধ্যে আনা যায় না ।

১৫। আমি ভেবেছিলাম
আমি জেরুজালেমের অধীশ্বর,
এ রাজ্যের পূর্ব-সঞ্চিত সমস্ত জ্ঞানের
আমি অধীশ্বর
—একথা সত্য যে আমি অনেক কিছু জানতাম।

১৬। আমি জানতে চেয়েছিলাম
জ্ঞান কি ;
জানতে চেয়েছিলাম
কা'কে বলে জ্ঞানের অভাব,
কা'কে বলে জ্ঞানের বিকার।
শেষে বুঝলাম
এ চাওয়া শুধু আত্মার বিড়ম্বনা।

১৭। জ্ঞানের সঙ্গে দুঃখই বাড়ে ;
জ্ঞানের পরিধি যে বাড়াতে চায়
সে বাড়ায় শুধু দুঃখ।

রাজা সলোমনের গান

[বাইবেল-এর The song of Solomon-এর ছায়া, অবলম্বনে]

১

আমার প্রিয়ার অঙ্গে জড়ান
কোন বরণের বাস,
অধরে তাহার কোন কুসুমের
সুরভিত নিশ্বাস,
আঁখির অতলে মৌন স্বপন,
বিস্মৃত কোন গানের মতন
অঙ্গ-পরশ মনের গোপনে
মুঞ্জুরে বারমাস।

রাতের আড়ালে ঘুমের মতন
অলক্ষ্য তার গতি।
উদ্যত-ধ্বজ-সেনাদল-সম
রুদ্র প্রখর অতি,
ধূপের ধোঁয়ার মতন কোমল,
মৃগশিশু-সম চির-চঞ্চল,
শরতের মেঘে বিদ্যুৎ-লেখা
চকিতোজ্জ্বল-জ্যোতি।

২

আমার প্রিয়া সে দাঁড়ায়ে কোথায়
সকরুণ আঁখি তুলে,
দিবস যেথায় মাগিছে বিদায়
ম্লান সন্ধ্যার কূলে।

অথবা প্রভাত-বাতায়ন-পথে
তাহারে দেখেছি অরুণের রথে
আলোক-সাগর মথিয়া চলিতে
ঢেউয়ে ঢেউয়ে দুলে দুলে।

আমার প্রিয়া সে কোন কুসুমের
মধুটুক বুক-ভরা।
নাম-নাহি-জানা কোন স্বরগের
বঁধু সে হৃদয়-হরা,
আকাশ হইতে খসে-পড়া চাঁদ,
সাধ-করে-রচা মরণের ফাঁদ,
আমার প্রিয়া সে না জানি কেমনে
সবার আপন-করা।

৩

প্রিয়ার লাগিয়া রচিনু শয়ন
কমল-মৃণাল তুলে।
নবমালিকার মালাটি গাঁথিয়া
দুলানু কণ্ঠ-মূলে।
বাসন্তী-রঙে বসন রাঙায়ে
মঞ্জীর পরি মঞ্জুল পায়ে
লতা-বিতানের সকল দুয়ার
আজিকে দিয়াছি খুলে।

সারা বুকখানি জুড়িয়া যতনে
লিখেছি পত্রলেখা।
দীর্ঘ বরষ যে গান শিখানু
সারিকা গাহিছে একা,
পাছে ধূলি লাগে সুবর্ণ রথে
নব কিশলয় বিছায়েছি পথে
আজি বনভূমি শবরীর মত
মাগিছে কাহার দেখা!

৪

বনে বনে বহে বসন্ত-বায়
ঢেউ লাগে মনে মনে,
আমার প্রিয়ার সন্ধান দিতে
পারে কি গো কোন জনে,
কুসুম-মুকুলে ভরি উঠে শাখী,
দিগন্ত হতে গাহে গান পাখী,
আজিকে যোদ্ধা ঢেকেছে বর্ম
উৎসব-আবরণে।

সারাটি আকাশ নির্মল নীল
বুকে পূর্ণিমা চাঁদ,
আলো আর ছায়া রচিছে ভুবনে
পথ-ভোলাবার ফাঁদ,
রস-ভার-নত দ্রাক্ষা-কুঞ্জে
পথ-ভোলা এক মধুপ গুঞ্জে,
আজি কবিবর কমল-কাননে
ভুঞ্জিবে চির-সাধ।

৫

কম্পিত বুকে পত্রের লেখা
মুহু মুহু পড়ে খসে,
কুসুম-পরাগ ধুয়ে মুছে যায়
শীতল ঘর্ম-রসে ;
মেঘান্তরিত পূর্ণিমা-শশী
শ্লথ মঞ্জরী পড়িতেছে খসি,
ডাকে চখাচখী, মর্মের ব্যথা
নিখিল ভুবনে পশে।

জাগে সারা হিয়া, জাগিছে রজনী
ঘনায় দীর্ঘ ছায়া,
ক্লান্তির ঘুম রচিছে নয়নে
বিস্মরণীর মায়া,
তিতায় শিশির অঙ্গ-বসন,
ভ্রষ্ট-কাজল অরুণ-নয়ন
বসন্ত-শেষ বনান্ত-ভূমি
অবশ শিথিল-কায়া।

৬

এক হাতখানি শ্রোণিতটে বেড়া
আরটি বুকের পাশে,
আমি সুন্দর প্রিয়া যে আমার
তাই মোরে ভালবাসে,

আঙুরের ক্ষেতে গোছা-ভরা ফল
যদি করে তাঁর মন চঞ্চল,
যদি অলক্ষ্যে তৃষাতুর হিয়া
অচ্ছোদ-তটে আসে।

পুষ্প দলিলে, ছিঁড়িলে বনের
বসন্ত-কিশলয়,
ভ্রমরের গানে ফিরে না তাকালে
যতখানি পাপ হয়,
যে মোর প্রিয়ার ঘুম ভাঙাইবে
ততখানি পাপ তাহারে ছুঁইবে,
আঁখির পলক তার দৃষ্টির
ঘটাইবে সংশয়।

৭

শূন্য তখন মধুর পাত্র,
গগনে ডুবিছে শশী,
আঁখি ঘুমে ভরা অঙ্গ অবশ
শ্লথ মালা পড়ে খসি,
হয়'ত ছিল সে দাঁড়াইয়া দ্বারে
কতগান গাহি ডেকেছে আমারে
খোলা দ্বারপথে শয়নের পাশে
অনাহুত এল পশি।

এখনও রয়েছে কুঞ্জ ভরিয়া
তারই অঙ্গের বাস,
এখনও বাতাসে বিদায়-ব্যথার
উথলিছে নিশ্বাস।
তারই কর্ণের ফুল-মঞ্জরী
ধূলি-লাঞ্ছিত অঙ্গনে ঝরি,
হেলায়-হারাণ শুভ লগনের
সকরুণ সম্ভাষ।

৮

হায় সখা হায়, আঁখির সলিলে
প্রেম কি গো ধোয়া যায়,
মনের মাঝারে যে পাতে আসন
তা'রে দূরে রাখা দায়,
তাই বারে বারে বসন্ত আসে,
নদী গায় গান কল-উচ্ছ্বাসে,
তাই নিশি নিশি সন্ধ্যা-গগনে
বাঁকা চাঁদ হেসে চায়।
তাই সপিয়াছি জীবন মরণ
তোমার চরণ স্মরি,
নব যৌবন বেঁধেছি অঙ্গে
গানে ও গন্ধে ভরি,
বিরহ বাড়ায় শুধু ব্যাকুলতা,
ফুল হয়ে উঠে সবখানি ব্যথা,
সবার উপরে তাই প্রিয়তম!
তোমারে লয়েছি বরি।

বন ও গাছ

(একটি ইংরাজী কবিতা অবলম্বনে)

ওটা কি দাহু ?
ওটা একটা বন ;
সংস্কৃত ভাষায়
ওর আরও অনেক নাম আছে—
অটব্যরণ্যং বিপিনং গহনং কাননং বনম্।
আমরা কি ওখানে যেতে পারি ?
চল, সামনেই 'ত।
এটা কি দাহু ?
এ একটা গাছ।
এটা ?   এটা ?   এটা ?
সবই গাছ।
আর এটা ?
এটাও একটা গাছ ;
তবে খুব বুড়ো, জীর্ণ, ভেঙে-পড়া—আমারই মত
তোমার বন কোথায় গেল দাহু !
এইখানেই আছে ;
আমরা এখন বনের মধ্যে ঢুকেছি,
তাই দেখতে পাচ্ছি না ;
গাছগুলা আড়াল করে আছে বনকে।

———

সুইগোয়া

[অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের মধ্যে খোয়ি-খোয়ি জাতির গান সুইগোয়া নামক দেবতার উদ্দেশ্যে]

সুইগোয়া !
তুমি আমাদের আদিপুরুষ ;
তুমি আমাদের রক্ষাকর্তা ;
বাজ-ভরা মেঘের মধ্য দিয়ে
বৃষ্টি নামিয়ে দাও অবিশ্রান্ত ।
আমাদের গরু বাছুর বাঁচুক,
আমরাও বাঁচি ।

নয়াকোপন

[পশ্চিম আফ্রিকার আদিবাসীদের আকাশ-দেবতা নয়াকোপনের স্তুতি

আকাশের মুখ চওড়া, আরও চওড়া, আরও চওড়া ;
পৃথিবী খুব বড়, আরও বড়, আরও বড় ।
একটাকে তিনি তুলে ধরেছিলেন উপরে,
আর একটাকে নামিয়ে এনেছিলেন---
অনেক দিন অনেক দিন আগে ।
আকাশের দেবতা—দেবতাদের বড় কর্তা ।
সেই আকাশ দেবতাই আমাদের ভরসা, আমাদের আশ্রয়

হে আকাশ দেবতা !
আমরা তোমারই পূজা করি ;
আকাশ-দেবতার দয়া,
বন্ধুগণ ! সে'ত তোমাদেরই লাভ ।

উজ্জ্বলতা

[৯৩ সংখ্যক সুরা ; কোরান]

দ্বিপ্রহর দিনের উজ্জ্বল আলোতে ।
রাত্রের অন্ধকারে
ঈশ্বর তোমাকে ত্যাগ করেন নি ;
করুণা তাঁর অবিচল ।
ভবিষ্যৎ হবে অতীতের চেয়েও উন্নত ।
শেষকালে
ঈশ্বর হবেন দানে মুক্তহস্ত,
আর খুশী হবে তুমি ।
পিতৃমাতৃহীন তোমায় তিনি দিয়েছেন গৃহ ;
চালিয়ে নিয়েছেন তিনি তোমাকে সত্যের পথে,
মোচন করেছেন তিনি তোমার দারিদ্র্য ।
অনাথের অমঙ্গল ক'রো না ;
প্রার্থীকে বিমুখ ক'রো না ;
সবাইকে জানিও তোমার প্রতি ঈশ্বরের করুণা ।

———

'মা গৃধঃ কস্যচিদ্‌ধনম্‌'

দীর্ঘদেহ হিরণ্যকেশ হিরণ্যবাহু বৈদিক আর্যের দল ;
এগিয়ে চলেছেন তাঁরা পূর্ব দিকে ;
দক্ষিণে সিন্ধু সৌবীর অঞ্চলে
আপত্তি বড় প্রবল।
দীর্ঘ তাঁদের ধনুর্বাণ ,
কর্ণযোনি বিষদিগ্ধ বাণ
তীব্র বেগে ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে চলেছে
বায়ুস্তর ভেদ করে—
চিশ্বা ! চিশ্বা ! চিশ্বা !
অশ্ব-বাহিত রথে ছুটে চলেছেন তাঁরা
শত্রুর অভিমুখে ।
গায়ে তাঁদের দুর্ভেদ্য বর্ম ;
সেনাপতি তাঁদের ইন্দ্র
বজ্র-বাহু বজ্র-হস্ত পুরন্দর।
তাঁর বজ্রাঘাতে ভেঙে পড়ছে শত্রুপুরী
তাসের প্রাসাদের মত।

দ্রাবিড় কোলেরা
লড়াই করছে মরছে পালাচ্ছে।

উচ্চ থেকে উচ্চতর হয়ে উঠছে
আর্য কণ্ঠে রণ-সঙ্গীত—
'এই ধনু দিয়া জিনিব গোধন যুদ্ধ করিব জয় ;
এই ধনু দিয়া তীব্র আহবে শত্রু করিব ক্ষয় ;

এই ধনু আজ শত্রুর কুল করুক নষ্টকাম ;
এই ধনু দিয়া সব দিক জিনি লভিব বিজয়ী নাম।'

পঞ্জাব আজ আর্য-ভূমি ;
কুরুক্ষেত্র, কুরু-পাঞ্চাল, মধ্যদেশ
আজ
দাস-শাসন মুক্ত ধনধান্যভরা বিশাল আর্যভূমি :
'মধু বাতা ঋতায়তে
মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।'
আর
আর্য-ঋষির কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে উদাত্ত স্বরে—
'ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যচিদ্‌ধনম্‌'।

'এই ধনু দিয়া' ইত্যাদি চার লাইন ঋগ্‌বেদ ৬।৭৫।২-এর অনুবাদ। অন্য দুইটি উদ্ধৃতি সুপরিচিত। চিশ্বা! চিশ্বা! চিশ্বা! বাণ-নিক্ষেপের শব্দ। ধনুকের ছিলা কর্ণ পর্যন্ত টানিয়া আনিয়া বাণ-নিক্ষেপ করা হইত। তাই বাণের বিশেষণ কর্ণযোনি। বিষদিগ্ধ=বাণের ফলায় অনেক সময় বিষ লাগান হইত। প্রথম দিকের বৈদিক আর্যরা ছিলেন যুদ্ধপ্রিয় ও জয়লিপ্সু। তবে সিন্ধু প্রদেশের দিকে প্রতিপক্ষের প্রতিরোধ-শক্তি খুব প্রবল থাকায় তাঁহারা ঐ অঞ্চল জয়ের আশা ছাড়িয়া গঙ্গা-যমুনা-বিধৌত অঞ্চল ধরিয়া পূর্বদিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। উপনিষদের ত্যাগ ও বৈরাগ্যের বাণী গাঙ্গেয় উপত্যকা বিজয়ের পরে রচিত।

সরস্বতী-সূক্ত

[ঋগ্‌বেদ ; ৭ম মণ্ডল, ৯৫ সংখ্যক সূক্ত ।

বৈদিক ভারতের ইতিহাসে অতিপ্রসিদ্ধ এই সরস্বতী নদী। ঋগ্‌বেদের যুগের সভ্যতা বহুলাংশে এই নদীর দুই তীরেই গড়িয়া উঠিয়াছিল। দ্বিতীয় ঋকে রাজা নহুষ কর্তৃক অনুষ্ঠিত এক দীর্ঘ যজ্ঞে নদী সরস্বতী তাঁহাকে বহু দুগ্ধ ও ঘৃত প্রদান করিয়াছিলেন এই ইঙ্গিত আছে।

পলিমাটির দেশ উত্তর ভারতে নদীগুলি কালে কালে স্রোতঃপথ পরিবর্তন করিয়াছে। অনেক নদী নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। সরস্বতী নদীকে আজ আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সূক্তটি পড়িলে বেশ বুঝা যায় যে সরস্বতী এককালে বিশালকায়া খরস্রোতা নদী ছিল। সরস্বতী আধুনিক কুরুক্ষেত্র অঞ্চলের মধ্যদিয়া দক্ষিণ পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রে গিয়া পড়িত।]

১

নদী সরস্বতী ;
লৌহময়ী পুরীর ন্যায় তিনি অধৃষ্য।
রথীর ন্যায় চলেছেন তিনি
আপনার জলরাশির সঙ্গে
চূর্ণ করে সমস্ত বাধা, চূর্ণ করে সমস্ত বিঘ্ন।

২

নদীগণের মধ্যে পবিত্রতমা এই সরস্বতী ;
পর্বত থেকে সমুদ্র পর্যন্ত তাঁর গতি ;
বহুধনদায়িনী তিনি
রাজা নহুষকে দিয়েছিলেন বহু ঘৃত বহু দুগ্ধ

৩

মানুষের হিতকারী তিনি ;
আবির্ভাব-সময়ে অল্পতোয়া,
বর্ষণকারী তিনি ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হ'ন।
যজমানদের তিনি দেন অমিতবল পুত্রপৌত্র,
তাঁদের শরীরকে করেন স্নান-নির্মল।

৪

আহ্বান কর দেবী সরস্বতীকে
এই শ্রুতিসুখকর যজ্ঞে।
নতজানু দেবতারা আসেন তাঁর যজ্ঞে ;
ধনবতী তিনি,
সখাগণের প্রতি অত্যন্ত দয়াবতী।

৫

হে শোভমানা সরস্বতী !
ঋষি বশিষ্ঠ তোমার জন্য উন্মুক্ত করেছেন যজ্ঞের দ্বার
হে শুভ্রবর্ণা দেবী !
বর্ধিত হও,
স্তুতিকারীদের কর অন্নদান,
আমাদের পালন করুক নিরন্তর তোমার স্বস্তিবাচন

———

পূষন্-সূক্ত

[ঋগ্‌বেদ ; ৬ষ্ঠ মণ্ডল, ৫৪ সংখ্যক সূক্ত।

পূষন্ সূর্যের আর এক রূপ। তিনি গৃহপালিত গবাদি পশুর রক্ষক। পথ চলার সময়ে দস্যু তস্কর ও বৃকাদি হিংস্র জন্তুর হাত হইতে মানুষকে রক্ষা করা তাঁহার আর এক কাজ। যাহা কিছু হারায় বা লুকান থাকে তিনি তাহা প্রকাশিত করেন। তিনি মানুষকে পাপ থেকে রক্ষা করেন ; তাই তাঁহার আর এক নাম বিমোচন। গ্রীক পুরাণের কৃষি-দেবতা প্যান-এর (Pan) সঙ্গে পূষনের সাদৃশ্য আছে।]

১

হে পূষন্ !
যিনি সব কিছু জানেন
এমন লোকের সঙ্গে আমাদের সম্মিলিত কর,
যিনি বিদ্বান,
যিনি সরল পথে আমাদের অনুশাসন দেবেন,
যিনি বলবেন
যা' তুমি হারিয়েছ তা' এইখানে এইখানেই।

২

দেব পূষন্ দ্বারা অনুগৃহীত আমরা
সেই লোকের সঙ্গ লাভ করব
যিনি আমাদের দেখিয়ে দেবেন সেই গৃহ,
আর বলবেন
যা' তুমি হারিয়েছ তা' এইখানে এইখানেই

৩

হে পূষন্ !
অনাহত তোমার রথচক্র ;
তা'র রথগৃহ হয় না রথচ্যুত ;
তা'র চক্রনেমি থাকে দৃঢ় অকম্পিত

৪

যে যজমান
চরু-পুরোডাশাদি অন্নে তাঁর সেবা করে
দেব পূষন্ রাখেন তাকে স্মরণে ;
ধনলাভে সেই হয় প্রথম ও প্রধান।

৫

হে পূষন্ !
রক্ষা কর আমাদের গোধনগুলি ;
রক্ষা কর আমাদের অশ্বগুলিকে
চোরের হাত থেকে ;
দাও আমাদের অন্ন নিয়ত অজস্রধারে।

৬

হে পূষন্ !
যারা সোমযাগ করে
রক্ষা কর সেই সব যজমানদের অশ্বগুলিকে ;
রক্ষা কর তাদের গোধনগুলিকে
যারা নিত্য করে তোমার স্তব।

৭

হে পূষন্ !
আমাদের গোধন হ'ক নাশহীন,
ব্যাঘ্রাদি দ্বারা তা'রা যেন হত না হয়,
তা'রা যেন গর্তে পড়ে আহত না হয়,
তা'রা যেন সন্ধ্যায় ফিরে আসে অনাহত অক্ষত দেহে

৮

হে পূষন্ !
আমাদের স্তোত্রকথা শোন,
সর্বতশ্চক্ষু সর্বেশ্বর দাতা
তোমার কাছে আমরা প্রার্থনা করি ধনরত্ন

৯

হে পূষন্ !
তোমার নির্দিষ্ট কর্মে বর্তমান আমরা,
কেউ আমাদের করতে পারে না হিংসা,
আমরা সর্বদা করি তোমার স্তবগান।

১০

হে পূষন্ !
দূর থেকে প্রসারিত কর তোমার দক্ষিণ হস্ত ;
আমরা যেন
আবার ফিরে পাই যা' আমরা হারিয়েছি।

———

অশ্বিদ্বয়-সূক্ত

[ঋগ্‌বেদ ১০ম মণ্ডল, ৬৪ সংখ্যক সূক্ত।

Among the divinitees of the light heaven we have first to mention the two Aswins, the horse-guiders. They are the earliest light-bearers in the morning sky··· As divine physicians they drive away sickness and bring medicines from far and near.··· —Adolf Kaegi

সূর্যের আলোক আকাশে ধাবমান হয়, উষার আলোকও তাই, সেইজন্য এই আলোক বা রশ্মিসমূহকে ঋগ্‌বেদে সর্বদাই অশ্ব বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। অশ্বিন্ শব্দের অর্থ অশ্বযুক্ত। শব্দটি সর্বদাই দ্বিবচনে ব্যবহৃত হয়। অশ্বিদ্বয় শব্দের অর্থ লইয়া মতভেদ আছে। যাস্ককৃত একটি অর্থ হইতেছে 'প্রাতঃকালের পূর্বে যে বিজড়িত আলোক ও অন্ধকার তাহাই অশ্বিদ্বয়'—রমেশচন্দ্র দত্ত

অশ্বিদ্বয়ের সূক্তগুলিতে নানা ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সূক্তগুলির এই এক বিশেষত্ব। মনে হয় ঘটনাগুলি একেবারে অমূলক নয় এবং সবগুলির রূপক দিয়া ব্যাখ্যা করাও সঙ্গত নয়।]

১

হে শুভ্র শোভনাশ্ব অশ্বিদ্বয়!
এস আমাদের যজ্ঞে;
শত্রুক্ষয়কারী তোমাদের কামনাকারী
আমাদের স্তুতিকে সেবা কর;
আর
তা'র সঙ্গে গ্রহণ কর
আমাদের এই হব্যসম্ভার।

২

হে অশ্বিদ্বয় !
মদজনক সোম লক্ষণ এই অন্ন গ্রহণ কর ;
হবির্গ্রহণের জন্য এস আমাদের দিকে ;
আমাদের শত্রুদের আহ্বান অগ্রাহ্য করে
শোন আমাদের আহ্বান।

৩

হে অশ্বিদ্বয় !
সূর্যের সঙ্গে এক রথে তোমাদের বাস ;
তোমরা আমাদের প্রার্থনা শুনেছ ;
আমাদের দিকে
ছুটে আসছে তোমাদের রথ ;
মনোরথের মতন তা'র গতিবেগ ;
শতদিকে সে করে আমাদের রক্ষা ;
লোক-লোকান্তর অতিক্রম ক'রে
ছুটে আসছে সে রথ আমাদের দিকে।

৪

দেবতারা করেন তোমাদের কামনা ;
পাথরের পেষণে সশব্দে অভিস্যূত হচ্ছে সোমরস,
সুন্দর তোমাদের
হবির্দানের জন্য আহ্বান করছে যজমান।

৫

হে অশ্বিদ্বয় !
অমৃতোপম তোমাদের ভোজ্য,
তাই দিয়ে পুষ্ট করেছিলে তোমরা অত্রিকে
যখন সে বদ্ধ ছিল পর্বতের কন্দরে ;
তোমাদের প্রিয় অত্রিকে তোমরা করেছিলে রক্ষা ।

৬

হে অশ্বিদ্বয় !
কর্মরত জীর্ণ চ্যবন ঋষিকে
তোমরা হবির্দানে দিয়েছিলে নূতন জীবন ;
ফিরিয়ে এনেছিলে তাঁকে দীর্ঘতর নূতন জীবনে ।

৭

আর
উদ্ধার করেছিলে তোমরা ভুজ্যকে
যখন তা'র বিরোধী শত্রুরা
ফেলে গিয়েছিল তা'কে সমুদ্রের মাঝখানে ।

৮

কর্মক্লান্ত বৃককে দিয়েছিলে শক্তি ;
শয়ুঋষির কাতর প্রার্থনা শুনেছিলে ;
পূর্ণ করেছিলে গাভীর আপীনগুলি দুগ্ধে ;
নিবৃত্তপ্রসবা গাভীগুলিকে করেছিলে দোহন-সমর্থা ।

৯

আমি বশিষ্ঠ,
দেবস্তুতিতে আমার প্রসিদ্ধি।
আজ প্রভাতে
নিদ্রোত্থিত আমি তোমাদের স্তুতি করি
শোভন সূক্ত দ্বারা।
গাভীগণ দিক আমাদের অন্ন ;
কেউ যেন তা'দের হনন না করে ;
আমাদের সর্বদা রক্ষা করুক তোমাদের স্বস্তিবাচন

———

ইন্দ্র-সূক্ত

[ঋগ্‌বেদ, ৭ম মণ্ডল, ২৮ সংখ্যক সূক্ত। বর্ষণকারী মেঘসমূহের অধিদেবতা ইন্দ্র বৈদিকযুগের দেব-সমাজের রাজা। তিনি বজ্রায়ুধ বীর যোদ্ধা, সেনাপতি এবং যুদ্ধে মানুষের প্রধান সহায়। উৎপাতকারী বহু অসুরের তিনি হন্তা। বৃত্রাসুর-হনন তাঁহার প্রধান রণকীর্তি। 'রসানুপ্রদানং বৃত্রবধো যাচকাচ বলকৃতিরিন্দ্র কর্মৈব তৎ'—যাস্কঃ]

১

হে ইন্দ্র !
তুমি বিদ্বান,
এস আমাদের দিকে শ্রবণ কর আমাদের স্তোত্র।
তোমার অশ্বগুলি আমাদের অভিমুখী হ'ক।
হে বিশ্বামিত্র !
সব মানুষ তোমার উদ্দেশে করে পৃথক হোম ;
তবুও
গ্রহণ কর আমাদের হোম।

২

হে ইন্দ্র !
ঋষিদের স্তোত্রকে কর রক্ষা ;
কর তার ফলদান ;
তোমাদের মহিমার কথা আমরা জানি।
হে উগ্র ! হে ওজস্বী !
হাতে যখন তুমি বজ্র ধারণ কর
তখন,
শত্রুজয়ে তুমি হও ভীষণ ও সর্বজয়ী।

৩

হে ইন্দ্র !
তোমার প্রীতির জন্য আমরা করি তোমার স্তব ;
আকাশ আর পৃথিবীকে তুমি কর সংযত।
তুমি যজ্ঞ কর মহাধনের জন্য, বলের জন্য ;
যারা তোমার যজন করে না
তোমার হিংসা তা'দের করে পীড়িত।

৪

হে ইন্দ্র !
দুর্মিত্র বাধক লোকেরা তা'দের পাপের ফল পায় ;
সে দিন
আমরা পাই যেন তোমার সাত্ত্বিক প্রকাশ।
পাপের নাশকর্তা প্রজ্ঞাবান বরুণ,
আমাদের মধ্যে যে অসত্যের আভাস পান,
সে অসত্য থেকে কর আমাদের বিমোচন।

৫

হে ইন্দ্র !
তুমি আমাদের স্তোত্র শুনেছ ;
হে ইন্দ্র !
দাও আমাদের মহৎ ধন ;
আমাদের রক্ষা করুক ব্রহ্মাকৃতি এই স্তোত্রকথা

———

যম-সূক্ত

[ঋগ্‌বেদ ১০ম মণ্ডল, ১৪ সংখ্যক সূক্ত। মৃত্যু, যম, যমলোক ইত্যাদি কথা আমাদের মনে আতঙ্কের সঞ্চার করে। যমলোকে পাপীরা যায় এবং পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ বিচিত্র প্রকারে বহু যন্ত্রণা সহ্য করে। ঋগ্‌বেদে কিন্তু যম, মৃত্যু, যমলোক সম্বন্ধে ধারণা অন্য প্রকার। যমলোক যেন সেখানে অবশ্যম্ভাবী অথচ প্রার্থনীয় এবং আনন্দ ও তৃপ্তির ব্যাপার। সূক্তটি মৃতসংকারের সময়ে প্রযুক্ত হইত। ঋগ্‌বেদে জন্মান্তরবাদের পরিচয় পাওয়া যায় না। এ ধারণা পরবর্তী কালের বলিয়া মনে হয়।

Yama is the son of Vivasvat and Saranya. He is the first mortal who died and discovered the way to the other world. He guides other men thither and assembles there in a house which is secured to him forever. —*Muir, Sanskrit Texts Vol. V*

"Whether the flames devour the body or the earth covers it, the spirit freed from all needs, moves through the air towards near life ; led by Pushan it crosses the stream and passes by Yama's watchful dogs to the world of spirits from which it came......... In the highest heaven in the Yama's......bright realm, beams unfading light, and those eternal water-springs ; there wish and desire and yearnings are stilled ; there dwell bliss, delight, joy and happiness." —*Adolf Kaegi*

১

সে মহান পথে যিনি গিয়াছেন চলে
পথ করে তাহাদের তরে,—
যাহারা আসিবে পরে,
বহু জনে যিনি মিলালেন এক সাথে,
বৈবস্বত সে রাজা যমকে
কর হবির্দানে সেবা।

২

সবার প্রথমে যম জেনেছেন সেই যাত্রাপথ
যে পথে মৃতরা সব চলে।
সে পথে প্রথম যাত্রী তিনি ;
সেই পথে গিয়াছেন পূর্বপুরুষেরা ;
সেই পথে যাবে তা'রা যাহারা এসেছে এর পরে

৩

কব্যের সহ মিলিত ইন্দ্র,
অঙ্গিরা সহ যম,
বৃহস্পতি ও ঋক্ক মিলিয়া হউন বর্ধমান।
যজ্ঞভূমিতে বিবর্ধমান মোদের পিতৃকুল,
স্বাহাধ্বনি ও স্বধাধ্বনিতে রক্ষা করুন সবে

৪

সুমুখে আস্তীর্ণ এই দর্ভময়ী ভূমি
হে যম !
সেখানে কর আসন গ্রহণ।
আমাদের পিতৃকুল বসেছেন সেথা
সঙ্গে করি অঙ্গিরার দল।
কবিকণ্ঠে স্তুত এই মন্ত্রগুলি করিছে আহ্বান
তোমাকে।
হে রাজা যম !
এ আহুত হবির্দানে হও হে মোদিত।

৫

বহুরূপ যজ্ঞযোগ্য অঙ্গিরার দল ;
এস যম তাঁহাদের সাথে
আনন্দ বর্ধন করি।
বিবস্বান্ পিতা তব,
তাঁহাকেও করহ আহ্বান।
কুশাস্তীর্ণ এ ভূমিতে
আসন গ্রহণ করি
করুন মোদের তিনি আনন্দ বর্ধন।

৬

অঙ্গিরা অথর্ব আর ভৃগুনামে
আমাদের পূর্বপুরুষেরা
সোমপ্রীত আছেন সেথায়।
মোদের প্রতিষ্ঠা হ'ক
তাঁহাদের অনুগ্রহে তাঁহাদের কল্যাণবুদ্ধিতে।

৭

মৃতের প্রতি : যাঁহারা ছিলেন পূর্বকালে
সেই পূর্ব-পিতামহদল
যে পথে গেছেন চলে
সেই পথে চল শীঘ্রগতি।
সেইখানে গিয়া মোরা
যম ও বরুণদেবে করিব দর্শন
অমৃতান্নে তৃপ্তি যাঁহাদের।

৮

সেখানে মিলিত হও সে পরম ব্যোমে
পূর্ব-পিতামহদের সাথে,
সেখানে মিলিত হও যমরাজ সনে,
ইষ্টপূর্তি হউক সেখানে ;
পাপকর্ম সব
এখানে পড়িয়া থাক,
শোভনদীপ্তি শরীরে যাও দিব্যধামে।

৯

পার্শ্ববর্তী লোকেদের প্রতি ঃ

রাক্ষস-পিশাচগণ হও অপগত,
বীত হও, হও দূরীভূত।
নবাগত প্রেত এই,
ইহার কারণে
করেছেন প্রক্ষালিত এই প্রেতভূমি
আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা।
যম তা'কে দিয়াছেন বিশ্রামের স্থান ;
শীতল-শীকর-স্নিগ্ধ এই পুণ্যভূমে
আসে দিন আসে রাত্রি এ উহার পর।

১০

মৃতের প্রতি ঃ চতুরক্ষ শবলবরণ
দ্বারপাশে সারমেয় দুটি ;
সরল ও ঋজুপথে অতিক্রম কর তাহাদের

অন্নবান পিতৃপুরুষেরা ;
তাঁহাদের কাছে এস ;
যমরাজ সহ আমোদে মোদিত তাঁ'রা নিত্য নিশিদিন।

১১

চতুরক্ষ তোমার সে সারমেয়দ্বয়
যমপুরী পালক তাহারা ;
তা'রা পথ রক্ষা করে ;
রক্ষা করে পথিক সকলে ;
তা'দের রক্ষণে
পথিককে কর সমর্পণ ;
দাও তাহাদের স্বস্তি, হর সর্বরোগ।

১২

দীর্ঘনস, প্রাণঘাতী, উর্ধপুচ্ছ দুই যমদূত
বিচরিছে মানুষের মাঝে ;
তারা সব আমাদের দিয়ে যাক সুভদ্র জীবন।
স্থাবর-জঙ্গম-আত্মা সূর্যদেব যেন
মোদের নয়ন-পথে থাকেন সতত।

পৃথিবী সূক্ত

অথর্ব বেদ ঃ

বৃহৎ সত্য আর পরম ঋত,
তপস্যা আর দীক্ষা
ধারণ করে আছে এই পৃথিবীকে।
ভূত এবং ভব্যের ঈশ্বরী সেই পৃথিবী দেবী—'
তিনি আমাদের বিশাল বিশ্ব রচনা করুন।
তাঁর মধ্যে নিহিত রয়েছে সমুদ্র এবং সিন্ধু।
আমাদের অন্ন এবং পানীয়,
অসংখ্য নানাবীর্য ওষধি
চলন্ত এবং জীবন্তের তিনি আধার,
চতুর্দিকের তিনি অধিষ্ঠাত্রী।

এখানেই ছিল পূর্ব পূব যুগের মানুষের রাজ্য,
এখানেই দেবতারা যুঝেছিলেম অসুরের সঙ্গে,
এখানে অশ্ব, এখানে গাভী,
এখানে পশুপাখীর বিচিত্র আশ্রয়।
তিনি ধারণ করে আছেন বৈশ্বানর অগ্নিকে,
সমস্ত হিরণ্যকে,
আদিতে তিনি মহাসমুদ্রের সলিলে ছিলেন মগ্ন,
তাঁকে রক্ষা করতেন দেবতার দল
অপ্রমত্ত তন্দ্রাবিহীন হয়ে।
তাঁর অনুশাসন মেনে চলে মনীষীরা।
তাঁর অমৃত হৃদয়খানি বিধৃত রয়েছে পরম ব্যোমে,
সত্যের দ্বারা তিনি আবৃত।

তিনি আমাদের উজ্জ্বলবীর্য দিন।
প্রতিষ্ঠিত করুন অনুত্তম রাষ্ট্রে।

এই পৃথিবীর পরিমাপ করেছিলেন অশ্বিনী কুমারেরা,
ত্রিবিক্রম করেছিলেন পরিক্রমণ,
শচীপতি একে নিষ্কণ্টক করেছেন।
এর বুকের উপর অহোরাত্র ছুটে চলেছে দ্রুতগামী
নানা সিন্ধু।
এই পৃথিবীর রয়েছে গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ,
রয়েছে অহোরাত্র আর সংবৎসর,
এখানে উৎপন্ন হয় ব্রীহি যব,
এই ভূমিতে নিহিত আছে ইলার সম্পদ।
এখানে মর্ত্যের মানুষ নাচে গায়,
শব্দ করে, যুদ্ধ করে, দুন্দুভি বাজায়।

এখানে বাতাস ওঠে,
হাঁস চিল শকুন আর পাখীর দল থাকে উড়তে।
ঝড়ের ধূলোয় গাছপালা যায় উপড়ে।
মাতরিশ্বা জেগে ওঠেন
জ্বলে ওঠে আগুনের শিখা।
এখানে মিলিত হয় বন্যপশুরা,
সিংহ, ব্যাঘ্র ও বৃকেরা।
নানা জাতের নরখাদক,
রাক্ষস ও পিশাচেরা।

কত জাতিকে, কত ধর্মকে বহন করে চলেছে
এই পৃথিবী,
কত তাদের ভাষা
কত অপরূপ তাদের গৃহ।
এখানে কত পথ
পায়ে চলার, গো-যানের
কত রথ্যা কত রাজমার্গ।
চলেছে ভদ্রেরা, চলেছে পাপীরা
সেই পথ শত্রুহীন, তস্করহীন হোক।
শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ।

আদিযুগ থেকে
কত জাতি বাস করেছে এই পৃথিবীতে,
অশ্ব যেমন ক'রে ধূলো ঝাড়ে তার গা থেকে,
তেমনি করে তিনি ঝেড়ে ফেলেছেন তাদের।
তিনি বনস্পতি আর ওষধির ধাত্রী
চলেছেন শোভাযাত্রায়, পুরোগামিনী
তিনি পরিপূর্ণ উল্লাস !
তাঁরই উপর রচিত হয় পবিত্র বেদী
বিশ্বকর্মা যজ্ঞকে করেন বিতত,
সুমহান যূপের দারু
পোঁতা হয় পৃথিবীর বুকে।
পবমানা তিনি আমাদের বাক্যকে মধুময় করুন।

তোমার হিমবান পর্বত আর গহন অরণ্যের ছায়া
সুখ দান করুক।

যারা হিংসা করে,
যারা অস্ত্রধর, যারা বিদ্বেষী,
ওগো পূর্বকৃত্বরী—
তারা আমার দাসত্ব করুক।
অজিত অহত এবং অক্ষত হয়ে
আমি যেন প্রতিষ্ঠিত হই।
তুমি বভ্রু, তুমি পিঙ্গলা, তুমি কৃষ্ণা,
তুমি ধ্রুবা, তুমি রোহিণী, তুমি বিশ্বরূপা,
তুমি যুগ যুগ ধরে বাসবের পরিরক্ষিতা।
তুমি মহান্ বেগ
তুমি স্পন্দন, তুমি বেপথু,
ভরে দাও তুমি সোনার আলোয়,
নিয়ে চল আমাকে তোমার কেন্দ্রে,
তোমার নাভিতে,
তোমার তেজঃপুঞ্জে,
তোমার শক্তির কূটে।
পর্জন্যদেব আমার পিতা,
মাতা ভূমিঃ পুত্রঃ অহং পৃথিব্যাঃ।
তোমার বুকের উপর
আমি শুয়ে থাকি চিৎ হয়ে,
পাশ ফিরি ডাইনে আর বাঁয়ে,
কখনও উপুড় হয়ে তোমার গায়ে গা ঠেকাই,
তুমি আমার চিরদিনের শয্যা
সর্বস্থ প্রতিশীবরী।

তোমার পুণ্য গন্ধ
চরাচরে বহন করে চলেছে ওষধিরা,
যে গন্ধ সঞ্চিত আছে পদ্মগর্ভে,
যা পেয়ে ধন্য হয়েছে অপ্সরা আর গন্ধর্বেরা ;
সূর্যার বিবাহের দিনে মৃত্তিকার যে গন্ধ
দেবতারা সংগ্রহ করেছিলেন,
যে গন্ধ নিহিত আছে নারী আর পুরুষের শরীরে
বীরের সৌভাগ্যে আর কন্যার লাবণ্যে,
যে গন্ধ তুমি দিয়েছ—
অশ্বকে, হস্তীকে, বন্য মৃগপশুকে,
আমাকে সুরভি কর সেই গন্ধের ভগ্নাংশে ।
আমি জয়ী, আমি পরাক্রমের মূর্তি,
অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্ ।
শত্রুদের নিহত ক'রে আমি বীর্যে উৎফুল্ল,
দিকে দিকে আমার বিজয় কেতন ওড়ে ।
যদ্ বদামি মধুমৎ যদীক্ষে তদ্ বনন্তি মা ।
যত গ্রাম যত অরণ্য, যত সভা যত সমিতি,
যত কুটির যত নগর—সর্বত্র তোমার জয়গান করি ।
হে ভূমি, হে মাতা,
তুমি দ্যুলোকের সঙ্গে সঙ্গতা হও,
হে সুভদ্রা, আমাকে প্রতিষ্ঠা দাও ;
হে কবি, আমাকে সম্ভূতি দাও ।
বিশ্বম্ভরা বসুধানী প্রতিষ্ঠা
হিরণ্যবক্ষা জগতো নিবেশনী ।
সা নো ভূতস্য ভব্যস্য পত্নী
উরুং লোকং পৃথিবী নঃ কৃণোতু ॥